শিশুতোষ

আল কুরআনের গল্প

১

এস.এম. রুহুল আমীন

শিশুতোষ

আল কুরআনের গল্প

১

এস. এম. রুহুল আমীন

বি.এ. (অনার্স), বি.এড, এম.এম.এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস)

প্রাক্তন প্রভাষক, দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পটুয়াখালী

ফাহিম বুক ডিপো

পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯৮১১৪৩১১১, ০১৭১২২৮৭৬৯৫

ইমেল : fahimbookdepo11@gmail.com

শিশুতোষ

আল কুরআনের গল্প- ১

এস. এম. রুহুল আমীন

প্রকাশক
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
ফাহিম বুক ডিপো
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৫
তৃতীয় সংস্করণ : জুন ২০১৭

বর্ণবিন্যাস
আলফা ডিজাইন

প্রচ্ছদ
কামরুল ইসলাম

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

AL QUR'ANER GOLPO Written by S.M Ruhul Amin.
Published by : Muhammad Nazrul Islam 50 BanglaBazar, Dhaka-110
Price : Tk- 120 US$ 5

উ ৎ স র্গ

মরহুম মা ও বাবা
এবং
আদরের রুহামা
নাকীব ও রাইমাসহ
বাংলা ভাষাভাষি সকল শিশুকে ॥

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালার। যার ভালোবাসার সৃষ্টি মানুষ আমরা আশরাফুল মাখলুকাত। আর মানুষের প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল সুন্দর সৃষ্টি। মানুষেরই চলার পথ আল কুরআন। সেতুবন্ধন করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুনিপুণভাবে।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুরা নিষ্পাপ। তাদের জানা বুঝা ও শেখার ক্ষেত্রে রয়েছে সীমাবদ্ধতা। তাদেরকে ভালো কিছু জানানো, বুঝানো ও শিখানোতে রয়েছে আমাদের দায়বোধ। সে দায়বোধ থেকেই 'আল কুরআনের গল্প' বইয়ের অবতারণা।

আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। তা আবারো প্রমাণিত হলো এ বই প্রকাশের মাধ্যমে। এই বইয়ের স্বপ্ন আগে বোনা হলেও সম্ভব হতো না। যদি না আমি জেলে যেতাম। অজানা কারণে। জেলের অবারিত ও অফুরন্ত অলস সময়টা কাজে লাগিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ছোটদের জন্য লেখার কষ্টকর কাজের দুঃসাহস করা।

মহান আল্লাহর আরেক প্রিয় গোলাম শহীদ সাইয়্যেদ কুতুবের লেখা 'আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য' বইটি লেখায় লোভাতুর করেছে নিঃসন্দেহে।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইসলামি চিন্তাবিদ ও লেখক শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম, ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ও ড.ফজলুল হক সৈকত স্যারদের কাছে যাদের মূল্যবান পরামর্শ আমাকে বইটি নির্ভুল করতে যারপরনাই সহযোগিতা করেছে।

সর্বোপরি এই বই প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে কঠিন কাজকে যারা সহজ করেছেন মামুন, নিয়াজ, নিজাম, বাবু, মোকাররম ও ফিরোজ। ফাহিম বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম-এর জন্য অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা এবং যাদের জন্য লেখা সেই আগামী প্রজন্মের উন্নত ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করছি কায়মনোবাক্যে। মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা ও কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন অনাগত প্রজন্মের পর প্রজন্মকে।

এস. এম. রুহুল আমীন

তৃতীয় সংস্করণে
প্রকাশকের কথা

আমাদের সমাজ জীবন আজ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাছাড়া সমাজে এক শ্রেণির মানুষের নিকৃষ্ট চিন্তাধারার কারণে দেশে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের তান্ডব লীলা চলছে।

ছাত্র ও যুবসমাজ আদর্শহীন নেতৃত্বের কারণে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের করাল গ্রাসের শিকার হয়ে পড়েছে অনায়াসেই । কিশোর তরুণরাও দিশেহারা। তারা সত্য পথের সন্ধান পাচ্ছেনা শত চেষ্টা করেও।

সমাজ চিন্তক ও সুলেখক এস.এম রুহুল আমীন রচিত 'আল কুরআনের গল্প' বইটি কোনো গতানুগতিক গল্পের বই না। বইটা শতভাগ শিশুতোষ হলেও সব ধরনের পাঠকদের মনের খোরাক যোগান দিতে সক্ষম হবে ও আগামী প্রজন্মের পথ দেখাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা তৃতীয় সংস্করণে সংশোধনীসহ শিশুদের উপযোগী ছবি দিয়ে পাঠ্য উপযোগী করে সাজানোর চেষ্টা করেছি ব্যাপক চাহিদার কারণেই। লেখকও পাঠক প্রিয়তাকে সামনে রেখে রচনা করেছেন আল কুরআনের গল্প-২ আল হাদীসের গল্প-১ এবং অন্যান্য শিশুতোষ সাহিত্য।

অন্যান্য বইয়ের মতো পাঠক প্রিয়তা আরো বাড়লেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

গল্পগুচ্ছ

১.	ভাইয়ের জন্য বোনের ভালোবাসা	০৭
২.	ঘুমিয়ে থাকা সেই লোকগুলো	১১
৩.	স্বার্থপর দু'জন বাগান মালিক	১৪
৪.	পুত্রের জন্য পিতার অকৃত্রিম ভালোবাসা	১৭
৫.	অবিশ্বাসীরাই আসহাবুল উখদুদ	২০
৬.	অলসতা হলো দুর্দশার কারণ	২৪
৭.	মিথ্যা অপবাদে জেলে গেলেন আল্লাহর নবী	২৮
৮.	জাতির নেতা হলেন হযরত ইবরাহিম (আ.)	৩২
৯.	আবু লাহাবের সত্য বিরোধিতার ফল	৩৫
১০.	শক্তিশালী বাদশাহ আবরাহা ও ছোট পাখি আবাবিল	৩৯
১১.	ধৈর্যশীল এক পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)	৪৩
১২.	হযরত সুলাইমান (আ.)ও রাণী বিলকিস	৪৭
১৩.	জ্ঞানী পিতার- জ্ঞানী পুত্র	৫১
১৪.	দু'টি বাগানের অহংকারী এক মালিক	৫৪
১৫.	কি কারণে জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যা শিশুদের	৫৭
১৬.	হযরত আইউব (আ.)-এর রোগ ও তাঁর ধৈর্য	৬০
১৭.	অল্প ভুলের খিসারত হলো অনেক	৬৩
১৮.	কর্মচঞ্চল এক নবীর কাহিনি	৬৭
১৯.	মাছওয়ালা নবী হযরত ইউনুস (আ.)	৭০
২০.	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও নৈরাজ্যই শেষ করলো সাবা জাতির সব সৌন্দর্য	৭৩
২১.	দোলনা থেকেই নবী হলেন ঈসা রুহুল্লাহ	৭৭

ভাইয়ের জন্য বোনের ভালোবাসা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত।

এক মানুষ অপর মানুষের জন্য। একজন অপরজনকে ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ ভালোবাসেন তার প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে। মানুষ ভালোবাসে তার পরম প্রভু আল্লাহকে। অবশ্য ঈমানের দাবীতে। সন্তান ভালোবাসে তার পিতামাতাকে। মা ভালোবাসে তার আদরের সন্তানকে। তেমনি ভালোবাসে ভাই-বোনকে। আর বোন ভালোবাসে তার প্রিয় ভাইকে।

পুরনো দিনের কথা। অনেক পুরনো দিনের কথা। হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগের প্রায় একশত বছর পরের কথা। দেশ শাসনের ভার পায় ফেরআউন। সে ছিলো কিবতি বংশের। তার মধ্যে জেগে ওঠলো সংক্রীর্ণমনা জাতীয়তাবাদের। গভীরভাবে জাতীয়তাবাদের চেতনায় পেয়ে বসলো তাকে। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। বেড়ে ওঠতে দেয়া যাবে না বনি ইসরাইলদেরকে। বনি ইসরাইল মিসরের আরেক প্রভাবশালী বংশ। এ গোত্রে জন্ম নেয় অনেক প্রভাবশালী নবী ও রাসূল। ফেরআউন চালাতে

লাগলো বনি ইসরাইলদের ওপর দমন-পীড়ন। দমন-পীড়ন রূপ নিলো বহুরূপে। উর্বর জমির মালিকানা বাতিল। বাসগৃহ ও সম্পত্তি বঞ্চিত করা। সরকারী চাকুরীর অযোগ্য ঘোষণা ও হীন কাজের কর্মচারী নিয়োগ। কম পারিশ্রমিক প্রদান ইত্যাদি। এভাবেই চললো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অবমাননা। উদ্দেশ্য একটাই। বনি ইসরাইলদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা মাত্র।

ব্যর্থ! সবই ব্যর্থ! ফেরআউন আঁটলো নতুন বুদ্ধি। বনি ইসরাইলকে দমাতে। শক্তি কমাতে। সংখ্যা অল্প রাখতে। সিদ্ধান্ত হলো মন্ত্রী হামানকে নিয়ে। ধ্বংস করতে হবে মূলে। ফরমান জারি হলো। লোক নিয়োগ করা হলো। গোয়েন্দা সদস্য। অনেক গোয়েন্দা সদস্য। যাবে বাড়ী বাড়ী। গর্ভবতী মায়েদের তালিকা হলো । ছেলে সন্তান হলে করা হবে হত্যা।

বাদশাহী ফরমান। কার্যকর হলো খুব শক্তভাবে। হত্যা করা হচ্ছে বনি ইসরাইলদের সব পুত্র সন্তানদের। ইমরানের স্ত্রী আছিয়া। গর্ভবতী হয়ে প্রসব করলেন পুত্র সন্তান। নাম রাখলেন মুসা। কিবতী ও মিশরীয় ভাষায় 'মু' মানে পানি 'উশা' মানে উদ্ধারকৃত। মুসা মানে হলো পানি থেকে উদ্ধারকৃত। মুসার মা পড়ে গেলেন দুশ্চিন্তায়। পুত্র সন্তানকে রাখলেন অতি সংগোপনে। কিভাবে রাখবেন? কিভাবে বাঁচাবেন সন্তানকে? এটা নিয়েই এখন মাথাব্যাথা তার। বাড়ী বাড়ী আসছে মহিলা গোয়েন্দা। সাথে নিয়ে আসে শিশু সন্তান। যে কোনো মূল্যে কাঁদতে বাধ্য করা হয় কোলের শিশুকে। কাঁদার শব্দ শুনে ঘরে শিশু থাকলে কেঁদে ওঠে স্বভাবগতভাবে। যাতে করে বুঝা যায়, লুকানো কোনো সন্তান আছে ঘরের মধ্যে।

চিন্তার আর শেষ নেই। এ যেনো বিরামহীন ভাবনা। ইলহাম হলো আছিয়ার কাছে। শিশু মুসাকে বাক্স বন্দী করে ভাসিয়ে দাও নীল নদে। মুসার পূর্বে ইমরানের আরো দু'সন্তান। এক ছেলের নাম হারুন। আর একটি মেয়ে নাম মারইয়াম। মুসার মা পড়ে গেলেন বিপদে। নদীতে

ভাসালে মুসার জীবন রক্ষা হবে কিভাবে? মুসা কি তাহলে মরেই যাবে? আল্লাহরই যে নির্দেশ। বাক্স তৈরি করলেন। মুসাকে বাক্সে ঢুকালেন। তারপর ছেড়ে দিলেন কয়েক মাসের শিশু মুসাকে আল্লাহর নামে। কাঁদে মুসার মা। কাঁদে বাবা। আরো কাঁদে ভাই ও বোন। দশ বছরের বোন মারইয়াম বুদ্ধি আঁটলো। উথলে উঠলো ভাইয়ের জন্য বোনের ভালোবাসা। ভাই ভাসতে ভাসতে কোথায় যায় দেখবে সে।

সতর্কতার সাথে। অতি সতর্কতার সাথে। টের যাতে না পায় কেহ। কেহ যাতে সামান্য টেরও না পায়। কথা অনুযায়ী কাজ। ভাই যায় পানিতে ভাসতে ভাসতে। বোন যায় নদীর কূলে কূলে সংগোপনে হাঁটতে হাঁটতে। বাক্স থামালো ফেরআউনের দাসীরা। ফেরআউনেরই ঘাটে। চমকে উঠলো মারইয়াম। হায়! হায়! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। আমার ভাইয়ের কী হবে উপায়? কিছু বলে না শুধু দূর থেকে দেখে আর ভাবে। বাক্স গিয়ে পৌছলো ফেরআউনের ঘাটে।

ভাসমান বাক্স খুলে ফেরআউনের লোকেরা। হতবাক হয়ে যায় দাসীরা। বাহ! এতো সুন্দর শিশু! ফুট ফুটে আলতো মাখা চেহারা। গায়ের রং যেন পুর্ণিমার চাঁদের আলো। দৌড়ে নিয়ে গেলো ফেরআউন ও তার স্ত্রীর কাছে। চলছে আলোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ। কী করা হবে এ সন্তানকে? কেহ পরামর্শ দিচ্ছে মেরে ফেলার। কেহ পরামর্শ দিচ্ছে লালন পালন করার। কেহবা বলছে এ সন্তান হবে বনি ইসরাইলের সন্তান। কোন কেউটে সাপের বাচ্চা। পরে বড় হয়ে ছোবল মারবে আপনাকে।

হরেক রকম মানুষ। নানান রকম মত। ফেরআউনের স্ত্রী শিশুটিকে দেখলেন নিজ চোখে। চোখ আটকে গেলো শিশুর সুন্দর চেহারায়। জেগে ওঠলো মাতৃস্নেহ। হৃদয়ে জোয়ার সৃষ্টি হলো ভালোবাসার। মায়ের স্নেহে লালন পালন আর পুত্রের মর্যাদা দানের আবদার জানালেন তিনি।

ফিরআউনকে তিনি বললেন। সন্তান বড় হয়ে গড়ে উঠবে আমাদের আদর্শে। পরিচয় দিবে কিবতি হিসেবে। আমাদের অসুবিধা কী তাতে?
গলে গেলো ফেরআউনের মন। মেনে নিলো স্ত্রীর আবদার। সিদ্ধান্ত হলো সন্তান পালনের। শিশুর মুখে দেয়া হচ্ছে ধাত্রীদের স্তন। পান করছে না কারো দুধ। মুখ সরিয়ে নিচ্ছে মুসা। দূর থেকে আড়ালে আবডালে দেখছে মারইয়াম। ফেলে দিয়ে ভয় আর জড়তা। বেরিয়ে এলো সবার মাঝে। প্রস্তাব দিলো সে, আমাকে দায়িত্ব দিন। আমি ভালো ধাত্রী এনে দিবো। যে পান করাবে দুধ। শিশু পালন করবে অতি যত্ন সহকারে। শিশু বেড়ে উঠবে আদর সোহাগ আর ভালোবাসার পরশে।
মারইয়ামের প্রস্তাবে রাজি হলো ফেরআউন দম্পতি। আল্লাহর পরিকল্পনা হলো বাস্তবায়ন। ধাত্রী মনোনীত হলো মুসার মা আছিয়া। দুধ পান শুরু করে মুসা। বেড়ে ওঠতে থাকলো ধীরে ধীরে। কিবতীয় চরিত্র গ্রহণ করে না সে। তার আদর্শ হয়ে ওঠে বনি ইসরাইলীয়। প্রবাদ বাক্য হয় সত্য। 'কুল্লু শাইয়্যিন ইয়ারজিউ ইলা আছলিহী'। সকল জিনিস ফিরে আসে মূলের দিকে। মুসার ক্ষেত্রেও হলো তাই। আল্লাহ রক্ষা করলেন মুসাকে মুসা হলেন আল্লাহর নবী। *(সূরা আল কাসাস অবলম্বনে)*

<u>প্রশ্ন</u>

১. হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বংশের সন্তান?

২. হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কারা উদ্ধার করেছিলো ?

৩. হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কোন নদীতে ভাসানো হয়েছিলো?

৪. হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাই বোনের নাম কী?

৫. হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতামাতার নাম কী?

ঘুমিয়ে থাকা সেই লোকগুলো

আশ্চর্য! অ-নে-ক আশ্চর্য।

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। ২৫০ খ্রিস্টাব্দে কিংবা কোন এক যুগের। সত্য অনুসন্ধানী কয়েকজন যুবক। বেড়াতে বের হয়েছিলো দ্বীন ও নিজেদের রক্ষার জন্য এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগত দেখার মানসে। চলতে চলতে তারা গেলো দূরে। বহু দূরে। আল্লাহর সৃষ্টি জগত দেখতে দেখতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লো তারা। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেয়া হয়ে পড়লো খুবই জরুরী। আল্লাহর নাম স্মরণ করে ও রহমতের প্রত্যাশী হয়ে একটি গুহায় প্রবেশ করলো তারা বিশ্রামের জন্য।

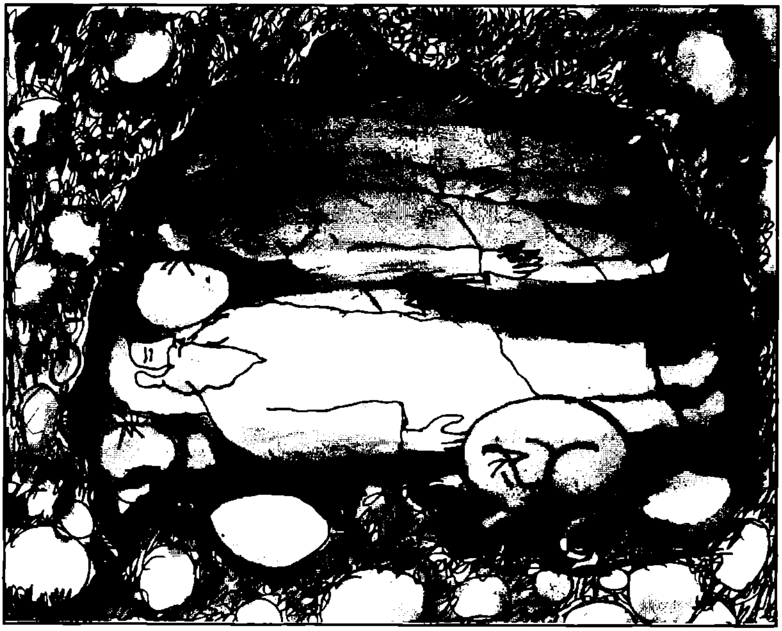

বিশ্রাম! সে কি বিশ্রাম! দিন যায় রাত আসে। মাস যায় বছর আসে। থামে না যুগেও। বিশ্রাম চলতে থাকে যুগের পর যুগ। ক্লান্ত শরীরে শুয়ে পড়লো এবং ঘুমিয়ে গেলো তারা। তারা পাহাড়ের মধ্যে এক গুহায় ঘুমাতে

থাকে। ঘুমের নেশায় বিভোর হয়ে। এক আর দুই নয়। একশো কিংবা দুইশো নয়। সুদীর্ঘ লম্বা সময়। একটানা সুদীর্ঘ তিন'শো নয় বছর পর্যন্ত। ভাঙলো অবশেষে তাদের ঘুম। আড়মোড়া দিয়ে জেগে ওঠলেন তারা। কিন্তু ক'দিন ঘুমালো বলতে পারলো না কেউ। কেউ বলে একদিন। কেউ বলে তার চেয়ে একটু বেশি হবে হয়তো। মতানৈক্যের পরে অবশেষে তারা এক মত হলো। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ আল্লাহর প্রতি ছিলো তাদের অবিচল আস্থা ও অগাধ বিশ্বাস। যাদের এ বিশ্বাস থাকে তাদের বলা হয় মু'মিন।

ঘুমাতে ঘুমাতে তাদের বেশ খিদে পেলো। পেট মোচর দিয়ে ওঠলো তাদের। পরামর্শ সভায় বসলেন তারা। তাদের জানা আছে। মুসলমানেরা কাজ করে পরামর্শ করে। গোপনীয় পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলো। একজনকে পাঠানো হলো লোকালয়ের বাজারে। পবিত্র খাদ্য ও পানীয় কিনে আনার জন্য। বলে দেয়া হলো তাকে। ভদ্রতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, কাউকে কিছু না বলে, চুপে চুপে চলে আসার জন্য। কিন্তু তা আর হলো না। ঘটে গেলো বিপত্তি। সে কি বিপত্তি!

অবশেষে লোকালয়ের লোকেরা জেনে গেলো সব। জেনে গেলো মুদ্রা দেখে। অবাক হয়ে পড়লো লোকালয়ের লোকেরা। হতবাক তারা। বিস্ময়ে বিমূঢ়। এ যে কয়েক শত বছর আগের মুদ্রা। কী এর রহস্য? কোথা থেকে এলো এসব? একজন, দু'জন। এভাবে জেনে গেলো বহুজন। সাড়া পড়ে গেলো সবখানে। উৎসুক জনতার ভিড় পড়ে গেলো পাহাড়ের পাদদেশে। উৎসুক লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো। জায়গাটি করতে হবে সংরক্ষিত ও স্মরণীয়। স্থানটি হবে আমাদের ইতিহাসের অংশ। কেউ বললো রহস্য ঘেরা এ জায়গায় হবে স্মৃতিসৌধ। আবার কেউ বা বললো এখানে হবে মসজিদ। অবশেষে হয়েছিলো মসজিদ নির্মাণ। স্থানটি হলো সাউদার্ন ইন তিউনিসিয়া। এখানে পাওয়া যায় সাতটি স্লিপারস এর মসজিদের সন্ধান। কারো মতে, জায়গাটি হলো তুরস্কে। কারো বা মতে এটি হলো জর্দানে।

মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হতেই পারে। এদের সংখ্যা ছিলো কতজন? কুরআনুল কারিম এভাবেই বললো। তারা ছিলো তিন জন। আর চতুর্থটি হলো তাদের পথের সাথী কুকুর। তারা ছিলো পাঁচ জন। ষষ্ঠটি হলো কুকুর।

তারা সংখ্যায় ছিলো সাত জন। অষ্টমটি হলো তাদের সাথে থাকা কুকুর। তাদের নাম জানা যায় এভাবে, ইয়ামলিকা, মাকসাম মিনা, কাশফুতাত, আযরাফ তিয়ুনাস, কাশাফ তিয়ুনাস, কিবইউ আনাস ও বুশ। আর তাদের সাথে থাকা কুকুরটির নাম হলো কিতমির। পাহাড়ের গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা লোকগুলোর পাহারাদার ছিলো কুকুরটি।

কুকুর তার সামনের দু'টি পা বিছিয়ে বসে থাকতো গুহার মুখে। আর গুহায় বসবাসকারী এ দলটি ঘুমাতো নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে। খুবই আরাম-আয়েশের সাথে। বিশ্ববাসীর কাছে গুহার অধিবাসীদের পরিচয় হলো 'আসহাবে কাহাফ' নামে। 'আসহাব' মানে দল আর 'কাহাফ' মানে গুহা। সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ালো গুহায় বসবাসকারী দল।

এভাবেই গুহায় বসবাসকারী রহস্যঘেরা এ দলটির যুবকরা রক্ষা পেলো জাহিলিয়াতের পাপাচার থেকে। আলোচিত হয়ে আছে যুগযুগ ধরে বিশ্ববাসীর মাঝে কৌতূহলভরে। মহান আল্লাহ্ মানুষের মৃত্যু ঘটান ও জীবন দান করেন। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই সকল শক্তির আধার। তাই প্রকাশিত হলো এ ঘটনার মাধ্যমে। *(সূরা কাহাফ অবলম্বনে)*।

প্রশ্ন

১. আসহাবে কাহাফ কারা ছিলো?
২. আসহাবে কাহাফের সংখ্যা ছিলো কতোজন?
৩. আসহাবে কাহাফ কতোদিন ঘুমিয়েছিলো?
৪. একজন বাজারে গিয়েছিলো কিসের জন্যে?
৫. লোকেরা পাহাড়ে কি নির্মাণ করেছিলো?

স্বার্থপর দু'জন বাগান মালিক

মানুষ স্বার্থপর। মানুষ অ-নে-ক স্বার্থপর।

স্বার্থপর সর্বকালে ও সর্বযুগে ছিলো। স্বার্থপর ছিলো অতীতে। স্বার্থপর আছে এখনও। এ রকমই দু'জন । স্বার্থপর বাগান মালিকের গল্পই এখন বলবো। যারা শুধু নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ভাবতো। ভাবতো সারাক্ষণ। ভাবতোনা অভাব অনটনে থাকা গরীব অথবা মিসকীনদের নিয়ে। অন্যদের নিয়ে তাদের ভাবার সময়ও ছিলো না একদম।

যারা এ রকম স্বার্থপর হয়। স্বার্থপর সেই মানুষের পরিণতি কী? তাই বলা হবে এখানে। ফুলে ফলে সুশোভিত। ম-ম করা গন্ধে ভরা। সবুজ শ্যামলের সমারোহ। চোখ জুড়ানো ও মনভুলানো দু'টি বাগান। দু'জন মানুষ এ বাগানের মালিক।

রাতে তাদের ঘুম হলো না । এপাশ ওপাশ করছে তারা। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায়। দুশ্চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠলো তাদের হৃদয় সমুদ্রে। তাদের কিসের চিন্তা ও দুর্ভাবনা? তাদের দুর্ভাবনা একটাই।

তাদের বাগান থেকে কিছু ফল খায়। গরীব-ফকীর ও মিসকিন লোকেরা। আর খেতে দেয়া হবে না। পুরোটাই খেতে হবে আমাদের। লাভবান হবো আমরাই। শপথ করে বসলো তারা। বাগানের ফল সংগ্রহ করবে সকালে।

তারা ভুলে গেলো মহান আল্লাহর শক্তির কথা। বললোনা তারা 'ইনশায়াল্লাহ'। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গরীব-ফকীর মিসকিন হবে বঞ্চিত। ঘুমের ঘোরে অচেতন তারা। অচেতন সুখনিদ্রায়। যখন তারা গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। তখন ঘটে গেলো অন্যরকম ঘটনা।

আচমকা এক ঝড়ো হাওয়া। বয়ে গেলো ঘুর্ণিঝড়। সে কি ঝড়? বয়ে গেলো ফল বাগানের মধ্য দিয়ে। সব গেলো তছনছ হয়ে। দুমড়ে মুচড়ে হয়ে গেলো সবকিছুই খড়কুটোর মতো। হয়ে গেলো সর্বনাশ! কিন্তু জানতোনা বাগান মালিকেরা। কী সর্বনাশই না ঘটে গেলো তাদের জীবনে। কিছুই টের পেলোনা তারা।

রাত গড়িয়ে সকাল হলো। সকাল বেলার মিষ্টি আলো পড়লো তাদের চোখে। একজন অপরজনকে ডেকে ওঠালো। কিহে! ওঠছোনা কেন? বাগানে যেতে হবে না? ওঠো, বাগানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। তারা ওঠলো। কথা বলতে লাগলো ফিসফিসিয়ে। ইশারা আর ইঙ্গিতে। টের যেন না পায় কোনো গরীব-দুঃখী। ফকির-মিসকিন। উপস্থিত হতে না পারে বাগানে। আনন্দের হাসি হাসতে হাসতে। মনের আনন্দে নাচতে নাচতে। তাদের আনন্দ ছিলো অনেক। তবে বঞ্চিত করার আনন্দ। তাদের আনন্দ ছিলো অন্যায় আর অসত্যে ভরপুর।

চলে গেলো তারা বাগানের কাছে। পৌঁছলো বাগানের মধ্যে। তাদের পেয়ে বসলো বঞ্চিত করার বেদনা। মাথায় হাত! ধপাস করে বসে পড়লো তারা। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়। ভেঙ্গে গেলো আনন্দের বাকসো। আনন্দ খান খান হয়ে গেলো কাঁচের ভাঙ্গা গ্লাসের মতো। হতবাক আর হতভম্ব হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে। একে অপরকে বলতে লাগলো আমরা কি আত্মভোলা? না, পথহারা পথিক? এ বাগান কি আমাদের? এরকমতো হওয়ার কথা নয়? আমরা কি সত্যি সত্যি নাকি স্বপ্ন দেখছি? এ বাগানতো আমাদের নয়। আসলে আমরা কি পথ হারিয়েছি? না কি আমাদের কপাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে? বুঝতে তো আমরা অক্ষম হচ্ছি। তাদের বিশ্বাসই হচ্ছে না। এটা কি তাদের বাগান? না, তাদের বাগানতো ফুলে ফলে ভরা। এটাতো হতেই পারে না। তাদের দু'জনের মধ্যে একজন ছিলো ঈমানদার। যিনি ঈমানদার তিনি বললেন। আমি কি তোমাকে বলিনি? আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন?

তাদের ভুল ভাঙলো। আর তারা তখন বলে ওঠলো। আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমরা যুলুম করেছি। ঘটনা যা ঘটার তা তো ঘটেই গেলো। আর অনুশোচনা করে লাভ কী? তারপরও অনুশোচনা।

তার পরও যা হয়। একে অপরকে দোষারোপ করা। তাদের মধ্যেও হলো এরকম। বাক-বিতণ্ডা আর ঝগড়া-ঝাটি। লাগলো একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে। তারা দু'জন মগ্ন হলো আত্মোপলব্ধি আর অনুশোচনায়। বলতে লাগলো-দুর্ভোগ আমাদের। আমরাই ছিলাম সীমা লঙ্ঘনকারী। সম্ভবত: আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন এর চেয়েও উত্তম বাগান।

আমরা আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহর কাছেই আশা করতে পারি। এভাবেই মহান আল্লাহ আত্ম প্রবঞ্চনাকারী ও জালিমদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রতিফল ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন গরীব ও মিসকিনদের ঠকানোর। কাজেই আমাদের সকল কথা-কাজে থাকতে হবে আল্লাহর নির্ভরতা। মুক্ত থাকতে হবে অপরকে ঠকানোর খারাপ চিন্তা থেকে। সকল সম্পদে শরীক করতে হবে অভাবী ও বঞ্চিতদের। অংশ দিতে হবে গরীব ও মিসকিনদের। *(সূরা আল কলম অবলম্বনে)*

প্রশ্ন

১. বাগানের মালিক ছিলো কতোজন?
২. বাগানটি কী কারণে তছনছ হলো?
৩. ঘূর্ণিঝড়ের আগে বাগান কেমন ছিলো?
৪. ঘূর্ণিঝড়ের পরে বাগান কেমন হলো?
৫. মালিকদের অনুশোচনার কারণটি কী?

পুত্রের জন্য পিতার অকৃত্রিম ভালোবাসা

হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

আসল নাম আব্দুল গাফফার । এছাড়াও তার নাম ছিলো শাকির । আল্লাহর ভয়ে অত্যধিক কান্নার কারণে নূহ হলো তার উপাধি । আল্লাহর নবীদের একজন ছিলেন তিনি । অন্য নবীদের মতোই তিনি । আল্লাহর পয়গাম নিয়ে পাগলপারা হয়ে ছুটতেন । গ্রাম থেকে গ্রামে । শহর থেকে শহরে । প্রচার করতেন আল্লাহর বাণী । হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো । আর বিরত থাকো গায়রুল্লাহর দাসত্ব থেকে । এভাবে চলতে থাকলো বছরের পর বছর । যুগের পর যুগ । শতাব্দীর পর শতাব্দী । সত্যানুসন্ধানী ও সত্যানুরাগী লোকের সংখ্যা খুবই কম । সাড়ে নয়শো বছর দীনের দাওয়াত দেয়ার পর দাওয়াত কবুল করলো মাত্র চল্লিশ কিংবা আশি জন লোক ।

সত্যি বলতে কি জানো? দুঃখের বিষয় হলো নিজের ছেলে কিনানই দাওয়াত গ্রহণ করেনি । হতাশ হলেন আল্লাহর নবী । জাতির দুরবস্থার কথা জানালেন নবী তাঁর মহান প্রভু আল্লাহর কাছে । অনুরোধ করলেন নাফরমান জাতিকে ধ্বংস করার । আল্লাহ রাজী হলেন । আল্লাহর নবীর প্রার্থনায় । আর যায় কোথায়? নূহের জাতির লোকের ওপর সিদ্ধান্ত হলো । আসমানি আযাব প্লাবনের । প্রশ্নের সৃষ্টি হলো । ঈমানদার মুসলমানরা বাঁচবে কিভাবে ?

আল্লাহ বাঁচাবেন তাঁর বান্দাহদের । সিদ্ধান্ত হলো । তারা ওঠবে কিস্তিতে । যারা কিস্তিতে ওঠবে তারাই বেঁচে যাবে প্রাণে । রক্ষা পাবে প্লাবন থেকে । নৌকা নিয়েও হলো হাসি-তামাশা । নৌকা বানাতে দেখে সত্য বিরোধী হোমরা-চোমরারা বললো । দেখো! নৌকায় হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা থাকবে । আর আমরা সবাই ডুবে মরবো? বাকীরা সব প্লাবনে ভেসে যাবে ।

থাকবেনা কোন নিদর্শন । ধ্বংস হয়ে যাবে সব কিছু । নৌকা বানানো শেষ হলো । নৌকাটি ছিলো তিন তলা । লম্বা ছিলো ১২০০ হাত । আর চওড়ায় ছিলো ৫৪০ হাত । বিশাল নৌকার যাত্রী হয়েছিলো এক জোড়া করে গরু, মহিষ, হাতিসহ সব প্রাণী ও ঈমানদার সকল মানুষ ।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্লাবন হলো শুরু। বিশ্বাসীরা সবাই ওঠলো হযরত নূহের আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৌকায়। অবিশ্বাসীরা রয়ে গেলো আল্লাহর আযাবের অপেক্ষায়। বিশ্বাসীদের নিয়ে এগিয়ে চললো নৌকা। পর্বতসম তরঙ্গমালার মাঝে। ঢেউয়ের তালে হেলে দুলে লক্ষ্যপানে।

বিপজ্জনক এ মুহূর্তে হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্রের টানে পিতৃত্ব জেগে ওঠলো প্রবল বেগে। নাফরমান পুত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কাফিরদের সাথে সলিল সমাধি। চোখের সামনে দেখতে পেয়ে হয়ে পড়লেন ব্যাকুল বিচলিত। ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি মানসিক দুর্বলতায়। হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভেতরের মানুষটি জেগে ওঠে। নফস প্রাধান্য পেলো নবীর ওপর।

পিতৃস্নেহে আর কাতর কণ্ঠে। অনুনয় বিনয় করে পুত্রকে ডাকলেন তিনি। হে পুত্র! ওঠে এসো। আমাদের সাথে। আর থেকো না কাফিরদের সাথে। তোমার জীবন সূর্য ডুবে যাবে। চুরমার হয়ে যাবে তোমার সব গর্ব-অহংকার। পিতার শত অনুনয়-বিনয়ে বেকুব, বেয়াদব ও বেয়াড়া পুত্র কোনো কর্ণপাতই করলো না। সে যৌবন ও শক্তি সামর্থের অহংবোধে ফুলে ফেঁপে ওঠলো। শুধু তাই না, অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে বলে ওঠলো। আমার কিছুই হবে না। অচিরেই আমি কোনো পাহাড়ে আশ্রয় নিবো। যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।

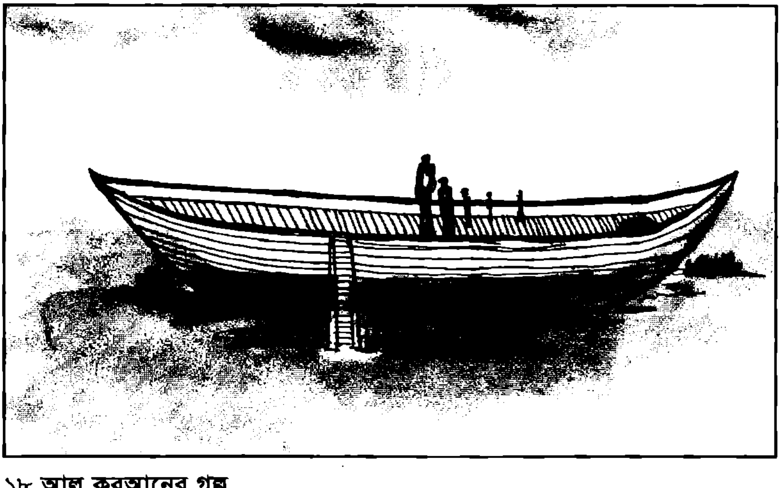

পুত্রের দাম্ভিকতা ও কুফরি আচরণের পরও পিতৃস্নেহে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন আল্লাহর নবী হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সর্বশেষ আহ্বান জানালেন তিনি। আজ আল্লাহর হুকুম থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনিই রক্ষা পাবেন। যাকে মহান আল্লাহ দয়ার আধার দয়া করে রক্ষা করবেন।

এর পর! এর পর যা হওয়ার তাই হলো। কথা-বার্তা বলার মধ্যেই হঠাৎ এসে গেলো স্বজোড়ে একটা তরঙ্গমালা। উভয়ের মাঝে আড়াল হয়ে পড়লো। পুত্রের প্রতি পিতার ভালোবাসার মধ্যে তৈরি হলো দেয়াল। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো। পিতা পুত্রের ভালোবাসার প্রাচীর। তছনছ হয়ে পড়লো ভালোবাসার সুরম্য অট্টালিকা। ভাসিয়ে নিয়ে গেলো দু'জনকেই। প্রিয় পুত্র নিমজ্জিত হয়ে গেলো সেখানে। সলিল সমাধি ঘটলো তার। শুধু কি তার ছেলে? অবিশ্বাসী সব মানুষের। হাবুডুবু আর পানি খেতে খেতে। পানিতে ভেসে ভেসে। শরীর অবশ হয়ে। বিরামহীন ঠাণ্ডায় অনাহারে আর সাঁতারের কষ্ট ভোগ করতে করতে। সবাই মারা গেলো। সবাই মারা গেলো অত্যন্ত নির্মমও নির্দয়ভাবে।

কত বড় মর্মান্তিক? ভয়ালো ও ভয়ানক সে দৃশ্য! পাহাড় সম ঢেউয়ের মাঝে নৌকা চলছে হেলে দুলে। পিতার ভালোবাসার কানাকড়ি মূল্যও দিলোনা বেয়াড়া ছেলে। শক্তির বাহাদুরি দেখিয়ে অবিশ্বাসী পুত্র। যে দৃশ্য অবলোকনে মানুষ কেন? বন্যপ্রাণীকেও করবে প্রভাবিত ও বেদনাপ্লুত। কিন্তু পাহাড় গললেও গলেনা কুফরির শক্ত হৃদয়। মুমিনরা জুদি পাহাড়ে অবতরণ করলেন সবাই। বস্তি গড়লেন সেখানে। প্লাবনের পর ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিলো হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিন পুত্র হাম, সাম ও ইয়াফিস ও তাঁর স্ত্রীসহ আশি জন মুসলমান। *(সূরা হূদ অবলম্বনে)*

<u>প্রশ্ন</u>

১. হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছিলেন?

২. হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বছর দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন?

৩. হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতে কতজন সাড়া দিয়েছিলেন?

৪. হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতিকে আল্লাহ কী শাস্তি দিয়েছিলেন?

৫. হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে কিসের অহংকার করেছিলো?

অবিশ্বাসীরাই আসহাবুল উখদুদ

আসহাব-অধিবাসী। আর উখদুদ-গর্তের।

সব মিলিয়ে আসহাবুল উখদুদ মানে 'গর্তের অধিবাসী'। কথায় বলে অন্যের জন্য গর্ত খননকারীই গর্তে পড়ে। আর এখানেও হয়েছে তাই।

কুরআনুল কারিমের অন্য ক'টা সূরার মতোই একটি সূরা আল বুরুজ। এখানে বলা হয়েছে গর্তওয়ালাদের নির্মম পরিণতির কথা। উল্লেখ করা হয়েছে তাদের নির্মম পরিহাসের কারণ ও করুণ বর্ণনা। ঈমান আনার অপরাধে যাদের আগুনের গর্তে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। মুসলমানের নির্মম ও নির্দয় মৃত্যু দৃশ্য দেখে যারা তামাশা করেছিলো। অবশেষে আগুনের গর্তে পড়ে তারাই হয়েছে আসহাবুল উখদুদ।

পাঁচ শত তেইশ সালের ঘটনা। ঈমানের দাবিদারদেরকে জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে পৃথিবীর শুরু থেকেই। এ যেন তারই ধারাবাহিকতা। দক্ষিণ আরবের নাজরানের ধর্মীয় নেতা উসকুফ। আসহাবুল উখদুদ বা গর্তে

আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদের নিক্ষেপ করে হত্যা করে নির্মমভাবে। এ ঘটনা পবিত্র হাদিস শরীফে একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ঘটনাটি হলো এমন। কোন এক বাদশাহর ছিলো একজন যাদুকর। বয়সের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যাদুকর বললো। হে বাদশাহ্ নামদার! আমার জীবন সূর্য প্রায় অস্তমিত। একটি মেধাবী ও ভালো ছেলে দিন। যে যাদু শিখে রাখবে। যাদুকরের কথা অনুযায়ী বাদশাহ্ তাই করলো। একজন চৌকস ও বুদ্ধিমান ছেলে দিলো। ঘটে গেলো বিপত্তি। যাদুকরের কাছে আসা-যাওয়ার পথে ছেলেটি পেলো সত্যের সন্ধান। সাক্ষাৎ হলো ঈসায়ী ধর্মের সাধক (রাহেব)-এর সাথে। রাহেবের কথায় প্রভাবিত হলো সে। ঈমান আনলো এক আল্লাহর ওপর। হলো ঈমানের আলোয় আলোকিত।

রাহেবের দীনি শিক্ষার কিছু অলৌকিক শক্তির অধিকারীও হলো ছেলেটি। যেমন দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি শক্তি দেয়া। কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করা ইত্যাদি। ছেলেটি এখন ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত। একথা জেনে গেলো বাদশাহ নিজে। বাদশাহ রেগে-মেগে খুন হওয়ার পালা। প্রথমে হত্যা করলো রাহেবকে। উদ্যত হলো হত্যা করতে ছেলেটিকে। কিন্তু ব্যর্থ হলো কয়েকবার। কোনো অস্ত্র দিয়ে কোনোভাবেই হত্যা করতে পারে না ছেলেটিকে বাদশাহ।

অবশেষে কি হলো জানো! বালকটি বলে দিলো তাকে মারার উপায়। কৌশল বাতলিয়ে বালকটি বললো। বাদশাহ্ নামদার! সত্যিই কি আপনি আমাকে হত্যা করতে চান? তাহলে এক কাজ করুন। প্রকাশ্যে জনসমক্ষে তীর মারুন এই বলে। 'বিইসমি রব্বিল গুলাম' অর্থাৎ এই বালকের রবের নামে। আপনি দেখবেন। তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ্ ছেলেটির কথা অনুযায়ী তাই করলো। ফলে ছেলেটি সত্যি সত্যি মারা গেলো।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী উপস্থিত জনতা সজোরে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো। "আমানতু বিরব্বিল গুলাম" মানে আমরা ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহ্ পড়লো বেকায়দায়। বাদশাহ্র সভাসদরা হলো চিন্তিত। তারা বললো, এখন কী করব আমরা? ঘটনা তাই হলো। যা থেকে আপনি দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। লোকজন আপনার ধর্ম ত্যাগ করছে। ছেলেটির ধর্ম গ্রহণ করছে লোকেরা দলে দলে। বাদশাহ্র রাগ আর ধরেনা। বাদশাহ্র নির্দেশে রাস্তার পাশে খনন করা হলো বিশাল বিশাল গর্ত। জ্বালানো হলো তাতে আগুন। দাউ দাউ করা সর্বনাশা আগুন। ঈমান ছাড়ার আহ্বান জানানো হলো সবাইকে। দুর্বল লোকেরা ছেড়ে দিলো ঈমান। আর ঈমানের দাবীতে অটলদের নিক্ষেপ করা হলো আগুনের গর্তে। কিভাবে পুড়ছে ঈমানদাররা। সে করুণ দৃশ্য দেখেছিলো তারা। আর অট্টহাসি হাসলো-যারা ছিলো অবিশ্বাসী ও বাদশাহ্র অনুসারী। (মুসনাদে আহমাদ ও মুসলিম)।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, এরকম অন্য আরেকটি ঘটনা। ইরানের এক বাদশাহ্ শরাব পান করে। হয়ে পড়ে নেশাগ্রস্ত। আপন বোনের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। অবলীলাক্রমে। ঘটনাটি জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়লো বিদ্যুৎ গতিতে। বাদশাহ্ ঘোষণা করলো, মহান আল্লাহ্ বোনের সাথে বিয়ে ব্যবস্থা হালাল করেছেন (না'উযুবিল্লাহ্)। জনগণকে এ কথা মানতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয় অন্যায়ভাবে। যারা রাজি হলো না তাদের ওপর নেমে আসলো শাস্তির খড়গ। আর নির্যাতনের স্টীম রোলার। এমনকি যারা মানতে রাজি হয় না তাদেরকে নিক্ষেপ করে জলন্ত অগ্নিকুন্ডে। মূলত: এই সময় থেকেই অগ্নি উপাসকদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে বিয়ে পদ্ধতির প্রচলন হয়। (ইবনে জারীর)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। আরেকটি ঘটনা। বেবিলনের অধিবাসীরা বনি ইসরাইলকে হযরত মুসা আলাইহিসসালামের

দীন থেকে বিরত রাখার জোর প্রচেষ্টা চালায়। যারা তাদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করতো তাদের ওপর নেমে আসতো নিমর্ম নির্যাতনের স্টিম রোলার। এমনকি তাদেরকে নিক্ষেপ করতো আগুনে ভর্তি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। *(ইবনে জারীর)*

আর একথা সূরা বুরুজে আল্লাহ্ বলেছেন এভাবে। মু'মিনদের সাথে করা কৃতকর্ম যারা আনন্দের সাথে উপভোগ করেছিলো। অবস্থান গ্রহণ করেছিলো তাদেরই তৈরি করা অগ্নিভরা গর্তের কাছে। অবশেষে তারাই নিহত হয়েছিলো যারা ছিলো এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও মালিক। তারাই হলো "আসহাবুল উখদুদ"। আর নির্দোষ ও নিরপরাধ মু'মিনদের দোষ ছিলো মহাপরাক্রমশালী ও স্বপ্রশংসিত মহান রবের প্রতি ঈমান গ্রহণ। তাফসিরবিদদের মতে এ অগ্নিকুণ্ডের মহানায়ক ছিলো ইয়ামেনের যালিম বাদশাহ যুনওয়াস। আসহাবুল উখদুদের ঘটনায় এটাই প্রমাণ হলো। কারো জন্য অন্যায়ভাবে কূপ খনন করলে সে কূপে কূপ খননকারীকে পড়তে হয়। *(সূরা আল বুরুজ অবলম্বনে)*

<u>প্রশ্ন</u>

১. আসহাবুল উখদুদ কারা?

২. ঈমানদার ছেলেটি মারার দোয়া কী ছিলো?

৩. কোন্ দেশের বাদশাহ্ শরাব পান করেছিলো?

৪. যাদু শিক্ষাকারী ছেলেটি কার কাছে ঈমান এনেছিলো?

৫. 'আসহাবুল উখদুদ' এর ঘটনা কোন সূরায় উল্লেখ আছে?

অলসতা হলো দুর্দশার কারণ

নবম হিজরী। প্রচণ্ড তাপদাহ।

সদ্য সমাপ্ত হলো হুনাইনের যুদ্ধ। হুনাইনের যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠালেন দূত। বিভিন্ন সাম্রাজ্যে ইসলামের আহ্বান নিয়ে। পাঠালেন রোম সাম্রাজ্যেও। রোমের বাদশাহ কাইসার। দাওয়াত কবুল করলো না। বরং এক লাখ সৈন্য নিয়ে হিমস নামক স্থানে স্বশরীরে হাজির হলো। খবর আসতে লাগলো আল্লাহর রাসূলের কাছে। বিভিন্ন জায়গায় দূতদের করা হয়েছে হত্যা। হত্যা করা হয়েছে প্রতিনিধিদলের সদস্যদেরও। করা হয়েছে বিভিন্ন যায়গায় সৈন্য সমাবেশও।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মোকাবেলা করতে হবে দুশমনদের। পরামর্শ সভা ডাকলেন সাহাবাদের নিয়ে। সিদ্ধান্ত হলো তাবুক অভিযানের। আহ্বান জানানো হলো মুসলিম উম্মাহকে। নাম লেখাতে লাগলেন দলে দলে মুজাহিদগণ। মুনাফিকরা করলো স্বভাব অনুযায়ী বাহানা। আশ্রয় নিলো ছলছাতুরীর। বায়না ধরলো তারা। কয়েক দিন আগে আসলাম হুনাইন থেকে। তীব্র তাপদাহ ও ফসল কাটার মৌসুম। আবার যুদ্ধ?

এ যুদ্ধের রসদ সংগ্রহে অংশ নিলেন অনেক সাহাবী। দান করলেন অনেক সাহাবা প্রচুর পরিমাণ সম্পদ। অগ্রগামীদের মধ্যে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার সকল সম্পদের অর্ধেক। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উজার করে দিলেন তার সকল সম্পদ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন। তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো? হে আবু বকর! আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্ব-হাস্যে জবাবে বললেন। আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথেষ্ট। পিছিয়ে ছিলো না নারীরাও। এগিয়ে এলেন তারা। দান করলেন সাধ্যমত। এমনকি ব্যবহারের গহনা নাকের নোলক ও কানের দুল দিয়ে ইতিহাসে স্থান করলেন তারা।

বেদনাহত হলেন বৃদ্ধা ও শিশুরা। ফিরে গেলেন নিজবাস গৃহে। ভগ্ন-হৃদয় ও মলিন বদনে। জিহাদে শরীক হতে না পেরে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা দিলেন তাবুক অভিমুখে। ত্রিশ হাজার সৈন্যের রণযাত্রা। উষ্ট্রারোহী ছিলো খুবই কম। পদাতিক বাহিনীই ছিলো মুখ্য। বেজে ওঠলো যুদ্ধের দামামা। খবর পৌঁছলো রোমের বাদশাহর কাছে। ভয়ে ভীত হয়ে রণভঙ্গ দিলো সে। একদম পিছুটান। মুসলিম বাহিনী কয়েকদিন অপেক্ষা করে চলে এলেন মদিনায়। যুদ্ধ অভিযানে না যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলো অনেকে। কারণে কিংবা অকারণে। সামর্থ্যের পর যাদের না যাওয়া ছিলো ভুল। আল্লাহ সে বিষয়টি সতর্ক করলেন তাঁর প্রিয় হাবিবকে। জবাবদিহি করালেন যুদ্ধে অনুপস্থিতদের। যার মধ্যে প্রায় আশি জন ছিলো

মুনাফিক। ইনিয়ে বিনিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যারা মিথ্যে অযুহাত দিয়েছিলো। ওজর পেশ করেছিলো সত্যের মতো করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবই মেনে নিলেন। বিদায় দিলেন তাদেরকে।

রেখে দিলেন তিনজন। তারা নেয়নি গোঁজামিলের আশ্রয়। বলেছিলেন প্রকৃত ঘটনা। সত্য কথা। এরা ছিলেন সাচ্চা ঈমানদার, ত্যাগী ও আন্তরিকতা সম্পন্ন। তাদের ত্যাগ সর্বজন স্বীকৃত ও বিদিত। হিলাল ইবনে উমাইয়াহ ও মুরারাহ ইবনে রুবাই। অংশগ্রহণ করেছিলেন বদরের যুদ্ধেও। কা'ব ইবনে মালিক বদরী সাহাবী না হলেও অংশ নিয়েছিলেন অতীতের সকল যুদ্ধে। এসব সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকড়াও করলেন তাদেরকে।

তাদের অপরাধ হলো অলসতা। যাই, যাব, যাচ্ছি। আজ কিংবা কাল। সকাল কিংবা বিকাল। অলসতার কারণে আর যাওয়া হয়নি তাদের যুদ্ধে। বিরত ছিলো যুদ্ধযাত্রা থেকে। থেকে গিয়েছিলো আন্দোলনের নেতা। প্রিয় নবীর বিনা অনুমতিতে। ফরমান জারি করলেন তাদের বিরুদ্ধে। কেও বলবে না কথা তাদের সাথে। করবে না বেচাকেনা। এমনকি লেনদেনও। দিবে না সালাম, এমনকি সালামের উত্তরও। শুরু হলো দুর্বিষহ জীবন। নামাজে যায়। বাজারে যায়। রাস্তায় হাঁটে। কথা বলে না কেহ। বলতে চাইলে মুখ ফিরিয়ে নেয় সবাই। আল্লাহর রাসূলকে (সা.) সালাম দিয়েও জবাব পাওয়া যায় না। হায়! হায়! একি অবস্থা? অসহনীয় জ্বালা। তীব্র যন্ত্রণার তীর। বিধতে থাকে সার্বক্ষণিক। হৃদয়ে হয় রক্তক্ষরণ। এক দিন নয়, দু'দিন নয়। চল্লিশ দিনের পর ঘোষণা এলো। প্রিয়তমা স্ত্রীদের থেকেও থাকতে হবে আলাদা। পুরোপুরিভাবে নিঃসঙ্গ হলো তারা। জীবন হলো বিষাক্ত। তবু টলছে না তারা। এক বিন্দু বিসর্গ ঈমানের দাবী থেকে। ভরসা করছেন তারা এক আল্লাহর ওপর। আনুগত্য করে চলছেন প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর। অপেক্ষায় আছেন আল্লাহর ফয়সালার। ক্ষমাশীল মহান আল্লাহর ক্ষমার। অনুশোচনা আর অনুতাপ চলছে অলসতার জন্য।

কা'ব ইবনে মালিকের ভাষায়। অপেক্ষার পালা হলো শেষ। পঞ্চাশ দিনের মাথায় ফজর পরে ওঠলাম বাড়ীর ছাদে। ধিককার জানাতে লাগলাম নিজেকে নিজে। হঠাৎ কানে বেজে ওঠলো কা'ব ইবনে মালেককে অভিনন্দন। খরাপীড়িত কৃষকের মেঘ দেখার মতো। ব্যাকুল হয়ে লুটিয়ে পড়লাম সিজদায়। দলে দলে লোক এসে বলতে লাগলো। মুবারাকবাদ! মালিকের ছেলে কা'ব। মহান আল্লাহ তোমার তাওবাহ্ কবুল করেছেন। আমি ওঠে ছুটে গেলাম মসজিদে নববীতে। প্রিয়নবীর সোহ্বতে আল্লাহর রসূলের চেহারা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। কা'ব ইবনে মালিকের সালামের জবাব দিয়ে জানালেন মুবারকবাদ। শুনিয়ে দিলেন কুরআনের আয়াত। কা'ব ইবনে মালিক আল্লাহর সন্তুষ্টিতে দান করলেন। অর্জিত অধিকাংশ সম্পদ। শপথ নিলেন। সত্য বলার কারণে যে আল্লাহ্ ক্ষমা করলেন। তাকে আর ছাড়বেন না কখনোই। এভাবেই সত্যের হলো জয়। আর অসত্যের হলো ক্ষয়। প্রতিষ্ঠিত হলো সত্য। অলসতাই হলো যাবতীয় দুর্দশার কারণ। *(সূরা তাওবাহ অবলম্বনে)*

প্রশ্ন

১. তাবুক যুদ্ধ হয়েছিলো কতো হিজরী সনে?

২. সত্য বলা তিনজন সাহাবীর নাম কি?

৩. তিনজন সাহাবীর অপরাধ কী ছিলো?

৪. কতোদিন পর তারা ক্ষমা পেলেন?

৫. তাদেরকে আল্লাহ কি শাস্তি দিয়েছিলেন?

মিথ্যা অপবাদে জেলে গেলেন আল্লাহর নবী

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আজকের আধুনিক মিসরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কেনান নামক স্থানে। যার বর্তমান নাম নাবলুস। জেরুজালেমের ত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মায়ের নাম রাহিল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর পিতাও ছিলেন একজন নবী। নাম হলো হযরত ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তাঁর পিতা ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি ছিলেন মানুষের নেতা। নবী মানে হলো সংবাদ বাহক। যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথ মানুষদেরকে বাতলে দেন। পরিচালনা করেন হিদায়েতের পথে। তাদেরকেই বলা হয় নবী।

তাই নবীদের একমাত্র কাজই হলো মানুষদেরকে সরল-সঠিক ও আলোর পথে পরিচালনা করা। নবীরা হলেন নিষ্পাপ। মা'ছুম ও নিষ্কলুষ। তাদেরকে ছুঁতে পারে না পাপ-পঙ্কিলতা ও গুনাহর কাজ। তাদের জীবন

চরিত্র হয় পুত-পবিত্র। চরিত্র মাধুর্য হয় উন্নত। ব্যতিক্রম ছিলোনা হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিত্রও।

হযরত ইউসুফের আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলো আরো এগারো ভাই। তাঁর মধ্যে বিন ইয়ামিন আপন ভাই এবং অন্যরা ছিলো সৎভাই। সৎভাইয়েরা হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিন ইয়ামিনকে একটু বাঁকা চোখে দেখতো। শয়তানের ওসওয়াসায় তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রও করেছিলো তারা। খেলার কথা বলে মাঠে এনেছিলো একদিন। হত্যার জন্য ফেলে দিয়েছিলো তাকে গভীর কূপের মধ্যে। অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু কথায় বলে না 'রাখে আল্লাহ মারে কে'? হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেলায়ও হলো ঠিক তাই। ঘটনাক্রমে হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বসবাস শুরু হলো মিসরের প্রধানমন্ত্রী আজিজের বাসগৃহে। বয়স আর কত হবে। সতের কি আঠারো। ছিলেন দুইকি তিন বছর। বেড়ে ওঠতে লাগলেন হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে।

রূপে-গুণে। আচার-আচরণে। চাল-চলনে তিনি হয়ে ওঠলেন প্রস্ফুটিত ও সুরভিত গোলাপের মতো। তাঁর এসব গুণাবলীতে দিনে দিনে মোহিত হচ্ছেন সবাই। তার সৎ চরিত্রের সার্টিফিকেটও ছিলো সবার হাতে হাতে। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর নাম জোলায়খা। সে ভীষণ ভালোবাসতো হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে। হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে পাগল হয়ে পড়লেন জোলায়খা। ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। অসম্ভব অপরূপা জোলায়খা। দীর্ঘ দিন হাবুডুবু খেতে লাগলো প্রেম সাগরে। শয়তানের সরাসরি হস্তক্ষেপে তার সাথে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায় জোলায়খা, একদিন লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে। আহ্বান জানায় ছলনাময়ী হয়ে বিনীত ও কাতর কণ্ঠে। কিন্তু কী করে সম্ভব? এটা যে একদম অসম্ভব। হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর নবী।

অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি প্রত্যাখ্যান করে চলতে লাগলেন জোলায়খার কু-প্রস্তাব। সিদ্ধান্তে অটল। কিন্তু এড়াতে যে পারেন না। কোন রকম কলা-কৌশলে।

হঠাৎ একদিন। ঘটে গেলো অন্যরকম ঘটনা। একাকী পেয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আহ্বান জানালেন। কুকর্মের জন্যে পাগল আজিজ পত্নী জোলায়খা। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বললেন তিনি, পানাহ্ চাই আল্লাহর কাছে। আর আপনি কি ভুলে গেছেন? আপনার স্বামীতো আমার মুনিব। আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে দিলেন দৌড়। পিছন থেকে জামা টেনে ধরলেন জোলায়খা। জামাও ছিঁড়ে গেলো হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর।

দরজার কাছে যেতে না যেতেই চলে আসলেন প্রধান মন্ত্রী আজিজ। ভীত সন্ত্রস্ত আজিজ পত্নী জোলায়খা। অত্যন্ত সু-কৌশলে বিচারের সুর তুলে অভিযোগ করলো উলটো হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে। দেখো! এ যে তোমারই কেনা গোলাম। তোমারই পত্নীর প্রতি হাত বাড়াতে উদ্যত। কতো বড়ো সাহস! আর কতো বড়ো স্পর্ধা? একে তাড়াতে হবে সহসা। আর সহ্য করা যায় না।

মজার ব্যাপার হলো কি জানো? যিনিই অভিযোগকারী আবার তিনিই বিচারপতি। হযরত ইউসুফের প্রতি দুর্বলতার কারণেই বললেন। কী করা যায়? তাকে কয়েক দিন জেলে রাখা যেতে পারে। বেশ, তাই করা হলো। মহিলারই একজন স্বজন সাক্ষ্য দিলেন । যে ছিলো ছোট্ট শিশু। কথা বলার বয়স হয়নি এখনো পুরোপুরি তার। সে বললো যদি তাঁর জামার পিছন দিক দিয়ে ছেড়া হয় তাহলে হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দোষ। আর মহিলা মিথ্যাবাদী। আর যদি জামার সামনের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয় তাহলে হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোষী। আজিজ পত্নী মহিলা সত্যবাদী।

আসলে জামার পিছন দিক দিয়ে ছেঁড়া ছিলো। যে কারণে হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নির্দোষ। আর অভিযোগকারী মহিলা আজিজ পত্নী হলো মিথ্যাবাদী। হলে কী হবে? অভিযোগকারী তো প্রভাবশালী ও দাপুটে। মহা শক্তিধর। প্রধানন্ত্রী আজিজের স্ত্রী বলে কথা। আর ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন তার কেনা গোলাম। আর যায় কোথায়? এরই নাম দুর্বলের প্রতি সবলের আঘাত। ক্ষমতা ও শক্তির দাপট বটে!

হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিক্ষেপ করা হলো জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বলেছিলেন মহান আল্লাহর কাছে। হে আল্লাহ! তোমার নাফরমানির চেয়ে জেলে থাকা অনেক ভালো। থাকতে থাকলেন অন্ধকার কারাগারে। সেখানেই দিতে থাকলেন মানুষকে দীনের দাওয়াত। খাটতে লাগলেন মিথ্যা অভিযোগে কারাবাস। আল্লাহর ইচ্ছায় অতিবাহিত হলো তাঁর জীবন।

ঘটনাক্রমে প্রধানমন্ত্রী আজিজ দেখলেন এক গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন। তাবীরতো কেউ করতেই পারে না। চলে আসলো হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে। বলে দিলেন স্বপ্নের তাবীর হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনায়াসে। খুশি হলেন প্রধানমন্ত্রী বা আযিযে মিশর। তাবীর মনোপূত হলো তাঁর। সম্মান হিসেবে বের করে আনা হলো তাকে। আট অথবা নয় বছর অন্যায়ভাবে কারাভোগের পর অন্ধকার কারাগার হতে মুক্তি পান তিনি।

শুধু কি তাই? ত্রিশ বছরের যুবক হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে করা হলো দেশের খাদ্যমন্ত্রী। মন্ত্রণালয় চালাতে লাগলেন তিনি। অত্যন্ত দক্ষতা, সুনাম ও যোগ্যতার সাথে। আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার কথাও ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। মিসরে ত্রাণ নিতে আসলেন তার ভাইয়েরা। দীর্ঘ সময় পর দেখা হলো তাদের সাথে। ঘটলো এক নাটকীয় ঘটনা। কৌশল আঁটলেন হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফন্দি করলেন পিতাকে দেখার। অপরাধী সাজালেন ছোট ভাই বিন ইয়ামিনকে। আটক করলেন তাকে। ভাইয়েরা হলো চিন্তিত। হয়ে পড়লেন বিমর্ষ ও ব্যাকুল। আশস্ত করে বলা হলো তাদের। বিন ইয়ামিনের পিতা আসলেই মুক্তি দেয়া হবে তাকে। হলোও তাই। আসলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ যে ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই পিতা। যিনি পুত্র শোকে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়েছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য। আর বিন ইয়ামিন তাঁরই আপন ছোট ভাই। ঘটলো এক আকর্ষণীয় মিলনমেলা। ঘটলো বেদনার সমাপ্তি। সৃষ্টি হলো হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার আনন্দ। সে কি অপরূপ দৃশ্য! এভাবেই মহান আল্লাহ হিফাজত করেন তার প্রিয় বান্দাহদেরকে। করেন সম্মানিতও। আশি বছর পর্যন্ত দেশ শাসন করে তিনি ইন্তিকাল করেন ১১০ বছর বয়সে। *(সূরা ইউসুফ অবলম্বনে)*

<u>প্রশ্ন</u>

১. কোন অপবাদে হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেলে গেলেন?

২. হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতার নাম কী?

৩. হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তি পেলেন কিভাবে?

৪. হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিরুদ্ধে কে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলো?

৫. হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন?

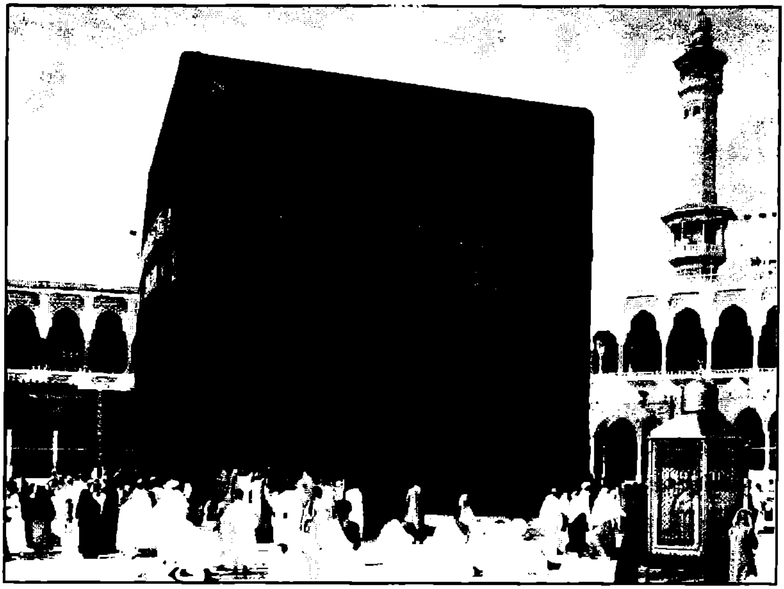

জাতির নেতা হলেন হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পিতার নাম হলো আজর। আজর ছিলো মূর্তি পূজারী। শুধু মূর্তি পূজারীই নয়। মূর্তির কারিগর হিসেবেও আরবে তার খুব খ্যাতি। কিন্তু মূর্তির বিপরীতে হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃঢ় অবস্থান। পুত্রের প্রতি পিতার আহ্বান মূর্তির দিকে। পুত্রের আহ্বান পিতাকে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহর দিকে। কেহ্ শুনলো না কারো কথা। শুনবে কি করে ? এতো সত্য মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্ব।

পিতা আজর আহ্বান জানালো একদিন। হে পুত্র চলো, আরবের বিখ্যাত ওকায মেলায়। পুত্রতো এসব জাহেলি চিন্তাচেতনার মেলাবিরোধী। শতহলেও পিতার আহ্বান। এড়াবেন কিভাবে? ভাবছেন আর ভাবছেন। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আঁটলো চতুর্দিকের শিরকী বিভীষিকায় তার মন খারাপ।

তাই অকপটে বলে দিলেন প্রিয় পিতাকে। আমি অসুস্থ। আসলে অসুস্থতা শারীরিক নয় মানসিক। মানুষের অন্যায় আর অবৈধ কাজে।

মহল্লার সবাই চলে গেলো মেলায়। শুধু রইলেন যুবক ইবরাহিম। হাতে নিলেন ধারালো কুঠার। চলে গেলেন পূজার ঘরে। কুঠারাঘাত করে শিরচ্ছেদ করলেন একএক করে সকল মূর্তির। বাকী রইলো মাত্র একটি। সবচেয়ে যেটা বড় ও মান্যবর। কুঠার ঝুলিয়ে রাখলেন তার গলায়। মেলা থেকে ফিরে এলো সবাই। ঢুকলেন মূর্তির ঘরে। ঢুকেই চোখ ছানাবড়া। হায়! হায়! সর্বনাশ। একি হলো আমাদের খোদাদের? কে ঘটালো এ সর্বনাশ? এক কান, দু'কান, ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। সবারই এক রা। এ কাজের কাজী হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চলে গেলো তারা হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। জিজ্ঞাসা করলো তাকে। তার উত্তর একটাই। জিজ্ঞাসা করো তোমাদের শক্তিধর মূর্তির কাছে।

হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্বান জানালেন। মানুষদেরকে এক আল্লাহর দাসত্বের জন্য। ক্ষেপে গেলো মক্কাবাসী। সিদ্ধান্ত নিলো তাকে নিক্ষেপ করা হবে জ্বলন্ত আগুনে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হলো আগুনে নিক্ষেপ। ফেরেশতারা অনুরোধ জানালেন হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। সাহায্যের আবেদন করার জন্য। হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যান করলেন দৃঢ়তার সাথে। বললেন তিনি, আমি কেন সাহায্য চাইবো? আমি যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখি। তিনিতো সবকিছু শুনেন ও জানেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা খুশি হলেন হযরত ইবরাহিমের আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর। উপাধিতে ভূষিতো করলেন 'খলিলুল্লাহ' বা আল্লাহর বন্ধু হিসেবে। আর আগুনকে নির্দেশ দিলেন। হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্য সু-শীতল হয়ে যাও। আল্লাহর নির্দেশে আগুন হলো সু-শীতল। হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এলেন অক্ষত অবস্থায়। হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে

আল্লাহ নির্দেশ দিলেন। কা'বা পুন:নির্মাণের জন্য। নির্দেশ অনুযায়ী করলেন তিনি কা'বা নির্মাণ। আহ্বান জানালেন বিশ্ব মুসলিমকে হজ্বের জন্য। এভাবে তিনি প্রেরিত হলেন জাতির নেতা হিসেবে।

বলা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। বিবি হাজেরা ও প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে নির্বাসন দিতে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করাও হলো তাই। সর্বশেষ পরীক্ষা করতে নির্দেশ আসলো। সবচেয়ে আদরের ধন, নয়ন মণি, স্নেহধন্য পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করতে। উদ্যত হলেন তিনি। ইসমাঈলও পেশ করলেন নিজেকে ধৈর্যশীল হিসেবে। চালানো হলো প্রিয় পুত্র ইসমাঈলের গলায় ছুরি। আশ্চর্য! ছুরিতো আর চলে না। আল্লাহ তাঁর কার্যক্রমে বেশ খুশি হলেন।

পাস করলেন এভাবে সকল পরীক্ষায়। উত্তীর্ণ হলেন গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে। পুরস্কার কী? পুরস্কার ঘোষণা করলেন মহান আল্লাহ। মানব জাতির নেতা হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শিখিয়ে গেলেন তিনি জাতিকে। আল্লাহর প্রিয় হতে হলে এভাবে কুরবানি করতে হয় নিজেকে। সংসার ধর্ম, প্রয়োজনে প্রিয় পুত্রকেও। দিতে হয় পরীক্ষার পর পরীক্ষা। তাহলেই সন্তুষ্ট করা যায় পরম প্রভুকে। হওয়া যায় আল্লাহর বন্ধু এবং জাতির অবিসংবাদিত নেতা। *(সূরা আল বাকারাহ অবলম্বনে)*

প্রশ্ন

১. হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতার নাম কী ও তার পেশা কী ছিলো?

২. হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করো?

৩. মুসলিম জাতির নেতা কে?

৪. মূর্তিগুলো কে ভেঙ্গেছিলো?

৫. হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীর নাম কী?

আবু লাহাবের সত্য বিরোধিতার ফল

আরব দেশ।

তিমির অমানিশা। ঘটলো আলোর বিস্ফোরণ। আবির্ভাব হলো শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর। আলোকিত হতে থাকলো বিশ্বময়। মহান আল্লাহর নির্দেশ। আমার সংবাদ পৌঁছাও। সর্বপ্রথম পৌঁছাও নিকটবর্তী আপনজনদের কাছে। আল্লাহর নবী। আল্লাহর কথা শোনাই তাঁর প্রধান কাজ। গভীরভাবে ভাবলেন তিনি। কী করা যায়? বুদ্ধি পেয়ে গেলেন সাথে সাথে। অনুসরণ করব আরব্য রীতি।

খুব সকাল। পূর্ব আকাশে সূর্য। উঁকিঝুঁকি মারছে মাত্র। ওঠলেন সাফা পাহাড়ের চূড়ায়। আরব দেশে এমনই হতো। কোনো সমূহ বিপদ সম্ভাবনা যখন দেখা দিতো। চূড়ায় ওঠে সতর্ক করা হতো সবাইকে। আর এটাই হলো বিপদ সংকেত পদ্ধতি। আল্লাহর নবীও তাই করলেন। বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন ইয়া ছাবাহাহ! হায়! সকাল বেলার বিপদ! রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আওয়াজ পৌঁছে গেলো সবার কানেকানে। বলাবলি করতে লাগলো একে অপরকে। কে দিচ্ছে এ আওয়াজ? বলা হলো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। পঙ্গ পালের ন্যায় ছুটে আসলো সবাই। যে পারলো না বার্ধক্য বা অসুস্থতায় সে পাঠালো প্রতিনিধি। এভাবেই সবাই পাহাড়ের পাদদেশে হলো সমবেত। সবার মধ্যে একধরণের আতংক ও ভীত সন্ত্রস্তভাব। চললো কানাকানিও।

এরপর আল্লাহর রাসূল প্রত্যেকটা গোত্রের নাম সম্বোধন করে বললেন। হে বনুহাসেম, হে বনু আব্দুল মুত্তালিব, হে বনু ফিহর। আমি যদি বলি পাহাড়ের পিছনে তোমাদের আক্রমণকারী সেনা দল রয়েছে। তোমরা কি তা মেনে নিবে? আমার কথা কি তোমরা বিশ্বাস করবে? সমস্বরে সবার জবাব হলো অবশ্যই। কারণ তুমিতো কখনো মিথ্যা বলোনি। তোমাকে আমরা সাদিক ও আল আমিন বলেইতো জানি।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন। তাহলে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন, তোমরা সবাই এক আল্লাহর আনুগত্য করো। যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে। আমাদেরকে এবং বিশ্ব জাহানের সবাইকে। আর তা না হলে, অপেক্ষা করো। ভয়াবহ কঠিন আযাবের। যা কারো জন্য মঙ্গলজনক নহে। আমি সে আযাবের শঙ্কাই করছি তোমাদের জন্য।

সকলের মতো সেখানে উপস্থিত ছিলো আবু লাহাব। আবু লাহাব হলো ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। সম্পর্কে হতো হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর আপন চাচা। চাচা হলে কী হবে? আগে থেকেই হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর বিপক্ষে। সত্য ও সুন্দর এ কারণে একদম পছন্দ হতো না তার। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইয়াতিম হওয়ার পর থেকেই পালন করেনি চাচার দায়িত্ব। দেয়নি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে আশ্রয়। বরং দিয়েছে একের পর এক কষ্ট। অশান্তি আর দুর্ব্যবহার।

জ্বলে ওঠলো কেবলমাত্র সে। সে কি জ্বলে ওঠা! তেলে আর বেগুনে। বলে ওঠলো গালি দিয়ে। "তাব্বালাকা আলিহাজা জামা'য়াতানা ?" সর্বনাশ হোক তোমার। এজন্যই কী তুমি আমাদের ডেকেছো? বলতে বলতে পাথর ছুড়ে মেরেছিলো প্রিয় নবীর দিকে। এভাবে আবু লাহাবের নির্যাতনের তীর আসতে লাগলো হযরত মুহাম্মাদের ﷺ দিকে।

আবু লাহাব একদা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলো। তোমার দীন গ্রহণ করলে আমি কী পাবো? হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাফ জবাব। কেনো? অন্যান্য ঈমানদার যা পায়? আবু লাহাবের প্রশ্ন। বাড়তি কোনো মর্যাদা আমার জন্য কি কিছুই নেই? হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। চাচা আপনি আর কী চান? উত্তরে বললো, তোমার দীনের যেখানে আমার ও অন্যদের মর্যাদা সমান। তোমার সে দীন আমার লাগবে না। সে ছিলো অহংকারী। মক্কায় মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটতম প্রতিবেশী ছিলো আবু লাহাব। উভয়ের ঘরের মাঝে ছিলো একটা মাত্র প্রাচীর। আরও প্রতিবেশী ছিলো হাকাম ইবনে আস। উকবা ইবনে আবু মঈত। আদী ইবনে হামরা। ইবনুল আস দায়েল হুজালী।

এ প্রতিবেশীরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিতো। নিজ বাড়ীতেও করে রাখতো ভীতসন্ত্রস্ত। নামাজরত অবস্থায় গায়ে জড়িয়ে দিতো উটের নাড়ি-ভুঁড়ি। রান্নার হাড়িতে ছুড়ে মারতো ময়লা আবর্জনা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সয়ে যেতেন সব নীরবে ও নিঃশব্দে। বাহির থেকে এসে শুধু মাঝে মাঝে বলতেন, হে বনি ইবনে আব্দে মানাফ। এ কেমন প্রতিবেশীসুলভ আচরণ তোমাদের? আরো একজন কষ্টদিতো। আল্লাহর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পথে বিছিয়ে রাখতো কাটা। বিধতো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সন্তানদের পায়ে। এটা ছিলো তার প্রতি দিনের কাজ। কাঁটার যন্ত্রণা কেমন? লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো আর খিলখিল করে হাসতো। সে আর কেহ নয় উম্মে জামিল। আবু লাহাবেরই স্ত্রী। আবু সুফিয়ানের আপন বোন।

নবুয়তের পূর্বে রাসূলের দু'মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো আবু লাহাবের দু'ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে। তারা দু'জনে তাদের বউকে তালাক দিয়ে ছিলো আবু লাহাবের নির্দেশে। উতাইবা আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে করেছিলো চরম বেয়াদবি। রাসূলের গায়ে মেরে ছিলো থুথু কিন্তু লাগেনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গায়ে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদোয়া করেছিলেন তাকে। সে কারণেই তাকে একটি কুকুর জীবন্ত ছিন্ন ভিন্ন করেছিলো। আল্লাহর রাসূল যেখানেই দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। ডাকতেন মানুষকে আল্লাহর পথে। সেখানেই আবু লাহাব তাকে মিথ্যুক বলে অপপ্রচার চালাতো। সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো তার অত্যাচার ও নির্যাতন।

অনেক নির্যাতন করেছে। পাথর মেরেছে। রক্তাক্ত করেছে আল্লাহর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমনকি শি'বে আবু তালিবের সময়ও সে সমঝোতা করে কাফেরদের সাথে। সব মিলিয়ে তার দুষ্ট হাত ও দুষ্ট আচরণের কারণে তাকে জাতির কাছে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় বদদোয়ার জন্য। ধ্বংশ হোক আবু লাহাবের হাত দু'টো। ধ্বংশ হোক আবু লাহাব নিজেও।

আবু লাহাব কিন্তু আবু লাহাব নয়। আবু লাহাব স্বয়ং আল্লাহর দেয়া উপাধি। তার আসল নাম ছিলো আব্দুল উযযা। আর গায়ের রং ছিলো উজ্জ্বল লাল মিশানো সাদা। যেন দুধে আলতা কিন্তু তার কাজ কর্মে হয়ে গেলো কুৎসিত ও নাফরমান। আগুনের শিখা। আবু লাহাব মানে আগুন বরণ। যেহেতু সে আগুনে জ্বলবে। তাই আল্লাহ তার এ নামটিই পছন্দ করলেন তার জন্য। অভিশপ্ত হয়ে থাকলো বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় পাতায়। *(সূরা লাহাব অবলম্বনে)*

প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর প্রথম কে পাথর মেরেছিলো?

২. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথে কে কাঁটা বিছাতো?

৩. আবু লাহাবের আসল নাম কী ছিলো?

৪. আবু লাহাব উপাধি কে কাকে দিয়েছিলো?

৫. রাসূলের উপর দেয়া আবু লাহাবের তিনটি শাস্তির নাম কী?

শক্তিশালী বাদশাহ্ আবরাহা ও ছোট পাখি আবাবিল

৫৭০ কি ৫৭১ সাল।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মক্কানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এ বছরেই। হিজরি রবিউল আউয়াল মাসে। আর এ বছরের মহরম মাসে ঘটে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঘটনাটি কুরআনুল কারিমের সূরা ফিলের আলোকে বলা যায় আসহাবুল ফিল বা হস্তী বাহিনীর ঘটনা।

আবরাহা ছিলো একজন ক্রীতদাস। ধীরে ধীরে তার বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যতা তাকে ইয়েমেনের বাদশাহর আসনে বসায়। তার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিলো অনেক। প্রভাব আর প্রতিপত্তি তাকে করলো বেপরোয়া। শুরু করলো ধরাকে সরা জ্ঞান করার। মহা শক্তিধর বাদশাহর অভিপ্রায় জাগলো। ইয়ামেনের রাজধানী 'সানআয়' একটি বিশাল আকৃতির গির্জা তৈরি করলো। আরব ঐতিহাসিকগণ একে আলকালীস অথবা আলকুল্লাইস বলে উল্লেখ করেছেন। গির্জার কাজ সমাপ্ত করে হাবশার বাদশাহকে লিখলেন, আমি আরবের হজ্বকে মক্কার পরিবর্তে 'সানআ'র গির্জার দিকে না ফিরানো পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না। সদর্পে ঘোষণা করলো আবরাহা সবখানে। উদ্দেশ্য একটাই যাতে মক্কার লোকেরা এটা আক্রমণ করে। আর সে সুযোগে কা'বা আক্রমণ করা যায় খুব সহজেই।

তাই হলো। জনৈক আরব সুযোগ বুঝে গির্জায় প্রবেশ করে মলত্যাগ করে। আর এ কাজটি করেছিলো একজন কুরাইশ যুবক। কারো মতে কয়েকজন যুবক গির্জায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। আবরাহার উত্তেজনাকর ঘোষণায় এর কোনোটা ঘটাই অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর নয়। আবার এসব ঘটনা ঘটানো আবরাহার নাটক হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তবে ঘটনা যাই হোক। বাদশাহ্ আবরাহার কাছে কা'বা ভক্ত অনুরুক্ত দ্বারা গির্জা অবমাননার রিপোর্ট পৌঁছলো।

কসম খেয়ে বসলো বাদশাহ্ আবরাহা। আবরাহা শপথ করে নিলো। কা'বাকে মাটির সাথে না গুঁড়িয়ে স্থির হয়ে বসবো না। শুরু হলো কথা অনুযায়ী কাজ। ষাট হাজার পদাতিক এবং নয়টি কিংবা তেরোটি হাতি নিয়ে কা'বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে হলো রওয়ানা। যাত্রা বাঁধাপ্রাপ্ত হলো ইয়ামেনের আরব সরদার যু-নফরের সেনাদল কর্তৃক। পরাভূত ও পরাজিত হলো তিনি। তারপর বাধাগ্রস্ত হলো খাশ আম এলাকায় নুফাইল

ইবনে হাবীব খাশয়ামী কর্তৃক। কিন্তু তার ভাগ্যে জুটে পরাজয়ের গ্লানী। খাশয়ামীকে বাদশাহ আবরাহার সেনাবাহিনী করে গ্রেফতার। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য সে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসলো আবরাহার হস্তীবাহিনী তায়েফের উপকণ্ঠে।

বনুসকীফ গোত্রের নেই প্রতিরোধের ক্ষমতা। তাদের সরদার মাসউদ একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে গেলেন বাদশাহ আবরাহার কাছে। বিনয়ের সাথে তার আশংকা থেকে বললেন, আপনি যে উপসনালয়টি ধ্বংস করতে এসেছেন তা এটি নয়। এটি আমাদের মন্দির। আর সেটি মক্কায় অবস্থিত কা'বা। আপনি আমাদেরটায় হাত দিবেন না। আপনার পথপ্রদর্শনের জন্য আবু রিগালকে দেবো আপনার সাথে। আবরাহা তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলো আনন্দচিত্ত আর খুশি ভরা মনে।

মক্কায় যাওয়ার আর মাত্র তিন ক্রোশ বা ছত্রিশ মাইল পথ বাকি। পথপ্রদর্শক আবু রিগাল পথিমধ্যে মাগাম্মাস বা আল মুগাম্মিস স্থানে মারা যায়। শুরু হয় আবরাহার ছন্দ পতন। যুগ যুগ ধরে আরবরা প্রতিশোধের পাথর মেরেছে আবু রিগালের কবরে। অভিশাপ দিয়েছে বনু সাকীফ গোত্রকে। বাদশাহ আবরাহাকে কা'বা দেখিয়ে দেয়ার অপরাধে। মাগাম্মাস থেকে লুটে নেয় আবরাহা বাহিনী তিহামাবাসী ও কুরাইশদেরও বহু সংখ্যক উট, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদি।

লুট করা সম্পদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের দু'শো উট ছিলো। বাদশাহ আবরাহা দূত পাঠায় আরব সরদার আব্দুল মুত্তালিবের কাছে। দূতের সাথে বীর দর্পে চলে এলেন আব্দুল মুত্তালিব। বাদশাহ আবরাহার কাছে। বাদশাহ আবরাহা তাকে বললো, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি কা'বা ধ্বংসের জন্য। তোমরা যদি যুদ্ধ না করো তোমাদের প্রাণ ও সম্পদ থাকবে নিরাপদ। আপনি এখন কী চান? প্রতি উত্তরে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আব্দুল মুত্তালিব বললেন। তোমার সাথে যুদ্ধ করার শক্তি ও সাহস আমাদের নেই। এটা আল্লাহর ঘর তিনি চাইলে রক্ষা করবেন। তবে আমার দু'শো উট তোমার লোকেরা এনেছে। আমি আমার উটগুলো ফেরত চাই।

বাদশাহ আবরাহা তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি শুধু উট চাচ্ছেন? অথচ আপনার ও আপনাদের ইজ্জতের কেন্দ্রবিন্দু পবিত্র কা'বা। আবার ধর্মীয় উপাসনালয়ও বটে। এটা আমার কাছে বড়ই তাজ্জব লাগছে।

আব্দুল মুত্তালিব সহাস্যে জবাব দিলেন। আমিতো উটের মালিক তাই আবেদনও আমার উটের জন্য। কা'বার যিনি মালিক তিনি তা রক্ষা করবেন। এটাইতো স্বাভাবিক ও নিয়মের কথা। আবরাহা ভুলেই গেলো 'অহংকার পতনের মূল'। বাদশাহ্ আবরাহা দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে বলে ওঠলো। তিনি আমার হাত থেকে কা'বা রক্ষা করতে পারবেন না। আব্দুল মুত্তালিব প্রতি উত্তরে বললেন তা আপনি ও তিনিই ভালো জানেন। আব্দুল মুত্তালিব তাঁর উট নিয়ে চলে গেলেন।

কারো মতে বাদশাহ আবরাহা একবার বললো। শুনেছি এখানে একটি শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর আছে। এটিকে ধ্বংস না করে দেশে ফিরবো না। এর শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করবোই করবো। আব্দুল মুত্তালিব বললেন। অতীতে কেউ পারেনি। পারবেন না আপনিও। এগিয়ে চললো আবরাহা। বিমর্ষ বদনে ফিরে এলেন আব্দুল মুত্তালিব। গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে আরববাসীদেরকে বললেন। যদি জীবন বাঁচাতে চাও পাহাড়ে চলে যাও।

আর তিনি চলে গেলেন কয়েকজন সরদার নিয়ে হারাম শরীফে। কা'বার দরজা ধরে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন। হে কা'বার মালিক! আপনি আপনার ঘর কা'বা ও এর খাদেমদের রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! বান্দাহ নিজের ঘর হিফাজত করে। তুমিও তোমার ঘর হিফাজত করো। মজার

ব্যাপার হলো কা'বা ঘরে থাকা ৩৬০টি মূর্তির কথা তারা ভুলে গেলো। প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর কাছেই জানালো। দু'য়া করে আব্দুল মুত্তালিব ও তার সাথিরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

বাদশাহ আবরাহা বীর দর্পে বিশেষ হাতি মাহমুদ নিয়ে মক্কায় প্রবেশে এগিয়ে যায়। মাহমুদ হঠাৎ ধপাস করে বসে পড়ে। প্রচণ্ড মারপিটে আহত হয় মাহমুদ। কিন্তু সেতো নড়েই না। এদিক-সেদিক দৌড়ে পালায়। কা'বা অভিমুখ হলেই গ্যাট হয়ে বসে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে ছোট ছোট পাখি। ঠোঁটে ও পাঞ্জায় পাথর কণা। বর্ষণ করে পাথর বৃষ্টি। আবরাহা বাহিনীর ওপর। প্রচণ্ড আক্রমণে। শুরু হয় আবরাহা বাহিনীর প্রচণ্ড চুলকানি। চুলকাতে চুলাকাতে খসে পড়ে তাদের চামড়া ও গোশতো। বের হয় রক্ত ও পুঁজ। দেখা যায় শরীরের হাড়। ওরা যেনো সব চর্বিত চর্বণ ও জাবর কাটা তৃণলতার মতো। এ দশা হয় বাদশাহ আবরাহারও।

ভোঁদৌড়ে পালিয়ে যায় পথ প্রদর্শক নুফাইল ইবনে হাবীব খাশয়ামী। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয় লাশের মিছিল। আবরাহাও ধরাশায়ী হয় খাশআস এলাকায়। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওখানেই সে। চুরমার হয় সব ক্ষমতার দাপট গর্ব ও অহংকার। আর আবাবিল পাখির আক্রমণ হয় মুজদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থান মহাসসির উপত্যকায়। এটাই হলো আসহাবে ফিলের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার স্থান। এ বিশাল ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। হয় আরব্য কবিতার সরস খোরাক। প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর্ অলৌকিক ক্ষমতা। সাত কি দশ বছর পর্যন্ত কুরাইশরা সকল ধরনের পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদাত করে। এ বছরটি ইতিহাসে স্থান করে নেয় 'আমুল ফিল' হিসেবে। আর এভাবেই আল্লাহ তাঁর ঘর হেফাজত করলেন। আবরাহার হাত থেকে। *(সূরা ফিল অবলম্বনে)*।

প্রশ্ন

১. আসহাবুল ফিল কারা?
২. আবরাহার উটের নাম কী ছিলো?
৩. আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার কাছে কী চেয়েছিলো?
৪. কুরাইশরা কা'বার দরজা ধরে কার কাছে কী প্রার্থনা করেছিলো?
৫. আবরাহা বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলো কারা এবং কিভাবে?

ধৈর্যশীল এক পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ভালোবাসেন।

ভালোবাসেন তার সকল সৃষ্টিকে। ভালবাসেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে।

তাইতো সকল সৃষ্টিই নিয়োজিত মানুষের কল্যাণের জন্যে। মানুষ নিয়েই মহান আল্লাহর যতো আয়োজন। মানবতার কল্যাণ ও মুক্তিই আল্লাহর একমাত্র লক্ষ্য। মানবতার মুক্তির জন্যই আল্লাহ্ পাঠালেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। তাদেরই একজন নবী হলেন হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ। মহান আল্লাহ্ নিলেন তার কাছ থেকে অনেক পরীক্ষা। সকল পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন সফলতার সাথে।

তাঁর ছিলোনা কোনো সন্তান। বলতে গেলে বৃদ্ধ বয়সে। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি হলেন একমাত্র পুত্রের পিতা। সে কী আনন্দ! আনন্দ আর ধরে না। পরিবারের সবাই খুশি। খুশি তার স্ত্রী বিবি হাজেরাও। আদর করে নাম রাখা হলো তাদের প্রিয় সন্তানের। সেকি নাম! ইসমাইল। শিশু ইসমাইল। বড় হতে লাগলেন স্বাভাবিকভাবেই। হযরত ইবরাহিম, বিবি হাজেরা ও ইসমাইল। যেন একই বৃত্তে ফোটা তিনটি ফুল। চলছে তাদের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ড। হাসি আর আনন্দের মধ্যে ডুবেছিলেন তারা।

কিন্তু বিপত্তি! সেকি বিপত্তি! হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অহী নাযিল হলো। পারবে না, একত্রে থাকতে পারবে না। বিবি হাজেরাকে নির্বাসন দিতে হবে। সাথে থাকবে শিশু ইসমাইলও। আল্লাহর নবী আর আল্লাহর নির্দেশ। অলঙ্গনীয় এবং শিরোধার্য। কী আর করা। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে চলছেন বিবি হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে নিয়ে। বিবি হাজেরার ভালোবাসা মিশ্রিত জিজ্ঞাসা। ওহে প্রাণের স্বামী! আমরা কোথায় যাচ্ছি? অম্লান বদন আর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তর। তোমাদেরকে নির্জনে নির্বাসন দিতে যাচ্ছি।

হাজেরার ব্যাকুল প্রশ্ন। একি আল্লাহর নির্দেশ? হ্যাঁ, হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাব।

নিশ্চুপ হলেন বিবি হাজেরা। রেখে এলেন কা'বার অদূরে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের কাছে। বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইলকে রেখে। বিমর্ষ বদনে চলে যাচ্ছেন হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন পিছনে। প্রিয়তমা স্ত্রী ও স্নেহধন্য পুত্রের দিকে। এযে আল্লাহর হুকুম। কিছুই করার নাই তাঁর। চলছেন আল্লাহর হুকুম পালন করে। অসহায় বিবি হাজেরা। সাথে পুত্র ইসমাঈল। কিন্তু নেই খাদ্য ও পানীয়। আছে আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। এই আল্লাহ নির্ভরতাই তার একমাত্র সম্বল ।

তারপরও তিনি বিচলিত ও শংকিত। কিভাবে বাঁচাবেন প্রিয় পুত্র ইসমাইলের জীবন? শিশুপুত্র ইসমাইলের জীবন বাঁচাতে পেরেশান হলেন বিবি হাজেরা। দৌড়াতে লাগলেন পাহাড় থেকে পাহাড়ে। সাফা থেকে মারওয়া আর মারওয়া থেকে সাফা পাহাড়ে। শুধুমাত্র এক কাতরা পানির প্রয়োজনে। ব্যর্থ হয়ে তিনি ফিরে এলেন। পানি না পেয়ে শিশুপুত্র ইসমাইলের কাছে। বিবি হাজেরার পাগলের মত দৌড়া-দৌড়ি পছন্দ হলো মহান আল্লাহর।

হতবাক! হতবাক হলেন বিবি হাজেরা। প্রবাহমান পানির ঝর্ণাধারা। শিশুপুত্র ইসমাইলের পায়ের কাছে। ইসমাইলের পায়ের ধাক্কায় সৃষ্টি হলো এক ঝর্ণাধারা। আটকানো হলো চতুর্দিক ঝর্ণাধারার। সৃষ্টি হলো কূপের। আর এ কূপই ইতিহাসে স্থান করলো 'জমজম' কূপ নামে। এ পানির রয়েছে বহুমাত্রিক গুণ। হয়েছে যার শুরু। কিন্তু যেন শেষ নেই তার। হবেও না শেষ কোনদিন। মহান আল্লাহর এক অনন্য কুদরত।

শিশু পুত্র ইসমাইল। বড় হতে লাগলেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। হাঁটেন এক পা, দু'পা করে। করেন দৌড়া-দৌড়িও। বাড়তে লাগলো তার বুদ্ধি। বুঝেন ভালো-মন্দ সব কিছুই। নতুন করে পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর হুকুম হলো। ওহী পেলেন তিনি। হে ইবরাহিম! প্রিয় বস্তুটি কুরবানি করো আল্লাহর রাহে। কুরবানি করলো পশু। কিন্তু আল্লাহর পছন্দ হলো না। হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বুঝতে বাকি রইলো না মোটেও। প্রিয় পুত্রের কুরবানি চাচ্ছেন মহান আল্লাহ। সিদ্ধান্ত নিলেন পুত্রকে আল্লাহর রাহে কুরবানি করার জন্য।

গেলেন হযরত ইসমাইলের কাছে। বললেন ওহে পুত্র! আমি নির্দেশিত হয়েছি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে কুরবানির জন্য। বাপকা বেটা! বললেন হযরত ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হে পিতা! এটা যদি আল্লাহরই নির্দেশ হয়, তাহলে আপনি তাই করুন। যা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ চাহেতো আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যেই পাবেন। কী আশ্চর্য ব্যাপার! চলে যাবে জীবন তার পরেও ধরবে ধৈর্য। কারণ আল্লাহর হুকুম পালনে সদা প্রস্তুত। যেমন পিতা-তেমন পুত্র।

চললেন পিতা-পুত্র। শয়তান শুরু করলো তার শয়তানী। ধোঁকা দিচ্ছেন পিতা-পুত্রকে। একবার নয়। দু'বার নয়। পরপর তিনবার। জামরার তিন জায়গায় সাতটি করে পাথর মেরে এগিয়ে চললেন তারা। এখনো তা

অনুসরণ করছেন আল্লাহর মেহমান হাজীগণ। এগিয়ে যাওয়া হলো শয়তানকে পরাস্ত করে। আরবের মিনা প্রান্তরে পৌঁছালো তারা। শুয়ে পড়লেন পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুখ রাখা হলো জমিনের দিকে। উপুড় হয়ে শুইলেন হযরত ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গলায় ছুরি চালালেন পিতা হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ছুরি তো আর চলে না। আকাশ-বাতাস দেখছে আল্লাহর হুকুম পালনের সুন্দরতম পবিত্র দৃশ্য। দেখছেন আল্লাহ তা'য়ালাও। আল্লাহ ওহী পাঠালেন। হে ইবরাহিম! স্বপ্ন তুমি সত্যি করলে। মহান আল্লাহ কবুল করলেন তাদের নিয়ত। বেঁচে গেলেন হযরত ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাজির হলো তরতাজা জান্নাতি দুম্বা, যা দেখতে ছিলো নয়নাভিরাম ও নাদুসনুদুস। কুরবানি হলো পশু। বিজয় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ও ত্যাগ। তৈরি হলো ত্যাগ কুরবানি আর আল্লাহ প্রেমের সুউচ্চ মিনার। যা চির সুউচ্চ ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে আল্লাহর প্রেমে পাগল মুসলিম মিল্লাতের মাঝে। *(সূরা আল বাক্বারাহ অবলম্বনে)*

প্রশ্ন

১. কে ছিলেন ধৈর্যশীল পুত্র?
২. বিবি হাজেরা কে ছিলেন?
৩. জমজম কূপ কোথায় অবস্থিত?
৪. হযরত ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে কী দেখেছিলেন?
৫. হযরত ইসমাইলের আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবর্তে কী কুরবানী হয়েছিলো?

হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও রাণী বিলকিস

আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।
ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহও ছিলেন তিনি ।
আল্লাহর হুকুমে শাসন করতেন প্রভাব আর প্রতিপত্তি নিয়ে। বুঝতেন পশুপাখিদেরও ভাষা। এমনকি পিঁপড়ার ভাষাও বুঝতেন তিনি। দৈত্য-দানব আর জিন পরী সবাই মানতেন তাঁকে। সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন যথেষ্ট পরিমাণে। আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা নিয়ে চলতেন দাপটের সাথে। পশু-পাখিদের নিয়েও করতেন তিনি মিটিং। সভা ও সমাবেশ।

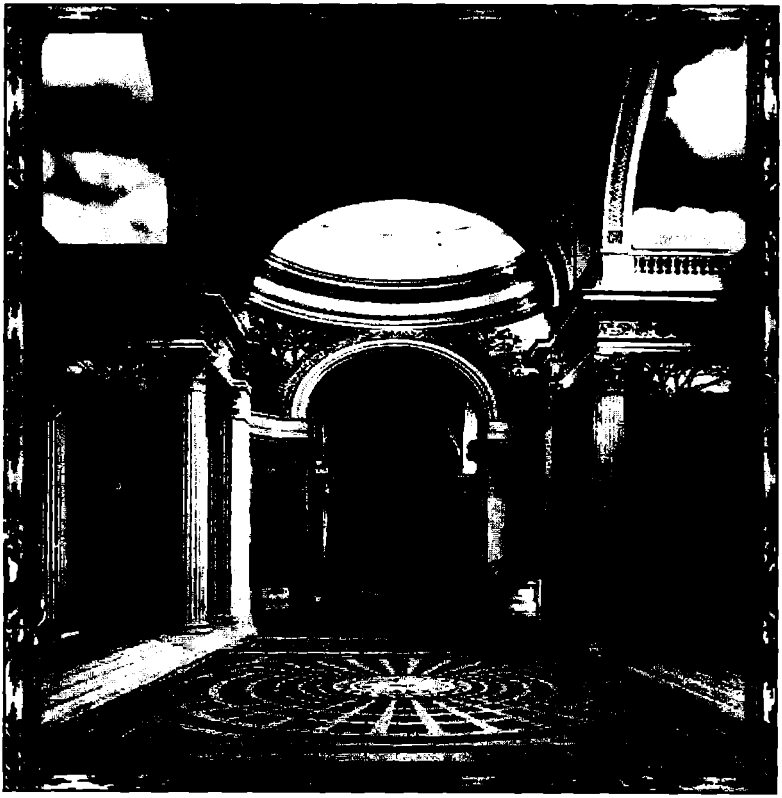

একদা বাদশাহ সুলাইমান বসলেন। পাখিদের নিয়ে মিটিং করতে। খোঁজ-খবর নিলেন তাদের সবার। পাখিদের একটা প্রজাতি। নাম তার হুদ হুদ পাখি। তাকে দেখতে না পেয়ে রেগে গেলেন বাদশাহ। জিজ্ঞেস করলেন অন্যদের। বিনা অনুমতিতে সে কেন অনুপস্থিত? বাদশাহী ঘোষণা দিলেন তিনি। যথাযথ কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে তাকে দিবো শাস্তি। এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে তার। বাদশাহ সত্যি সত্যি রেগে গেলেন। বসে রইলেন কারণ শুনার জন্য। হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলো হুদহুদ পাখি বাদশাহর দরবারে।

হুদহুদ পাখি বললো, বাদশাহ নামদার! আমি অবগত হয়েছি। যা ছিলো আপনার অজানা। এবার আমি তা আপনাকে শোনাবো। আল্লাহর দুনিয়ায় একটা এলাকা রয়েছে। নাম তার সাবা। আর সেখান থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছি আপনার জন্য। সাবা জাতিকে শাসন করছেন একজন নারী। নাম তার বিলকিস বিনতে শারাহীল। কোন কিছুর অভাব নাই তাঁর। তাঁর রয়েছে এক বিশাল সিংহাসন। যার দৈর্ঘ আশি হাত, প্রশস্ত চল্লিশ হাত আর ত্রিশ হাত উঁচু। দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ কি আপনি জানেন? তারা হলো মুশরিক। আল্লাহর সাথে অসংখ্য জিনিসকে শরীক করছে প্রতিনিয়ত।

এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের সিজদাহ করছে তারা। আর শয়তান সৎ পথ থেকে বিরত রাখছে তাদের। চিত্তাকর্ষক করে দেখাচ্ছে তাদের কার্যকলাপ। আমার প্রশ্ন হলো। তারা কেন এক আল্লহর ইবাদাত করেনা? মহান আল্লাহ তো জানেন গোপন ও প্রকাশ্যের সব কাজ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আর মহান আল্লাহ তো সুবিশাল আরশের মালিক।

বাদশাহ চুপ রইলেন। শুনলেন তার শেষ কথা পর্যন্ত। বিচক্ষণতার সাথে বললেন যাও। তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও। আমার পত্রটি নিক্ষেপ করো তাদের কাছে। একটু দূর থেকে দেখবে তারা কী জবাব দেয়? জি, হুজুর জাঁহাপনা। আপনার আদেশ শিরোধার্য। কথা অনুযায়ী কাজ। নড়চড় হবে না একচুল পরিমাণও।

হুদহুদ পাখি চলে গেলেন। রাণী বিলকিসের রাজ দরবারে। দিলেন বাদশাহ সুলাইমানের চিঠি। রাণী বিলকিস চিঠি পেয়ে খুললেন। ৩১২ জনের বিশাল উজিরের সংখ্যা নিয়ে বসলেন। বললেন পরিষদ বর্গের

কাছে। চিঠি এসেছে। বাদশাহ সুলাইমানের কাছ থেকে। লেখা আছে তাতে। শুরু করা হয়েছে পরম করুনাময় আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহ.... বলে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে আহ্বান জানানো হয়েছে শক্তি প্রদর্শনের কিংবা আত্মসমর্পণের। আমি কি করতে পারি এখন? আমি তো আপনাদের পরামর্শ ছাড়া করিনা কোনো কিছুই। বলুন এখন আপনারা।

সেনাবাহিনীর কাজই হচ্ছে বীরত্ব প্রদর্শন। তার পরও তারা ক্ষমতা ছেড়ে দেয় রাণী বিলকিসের কাছে। এখানেও হলো তাই। তারা বললো স্বগর্বে, আমরা শক্তিশালী ও বীর যোদ্ধা। সিদ্ধান্ত নিবেন আপনি। ভেবে দেখুন, আমাদের কী সিদ্ধান্ত দিবেন? নারীত্বের কোমল হৃদয়। প্রকাশ পেলো রাণী বিলকিসের কথায়। স্বভাবের বাহিরে গিয়ে প্রতিপক্ষ ভাবলেন না পুরুষদের। আবির্ভূত হলেন স্বাভাবিকভাবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা না করে। জব্দ করতে চাইলেন সুকৌশলে। রাণী বিলকিস বললো তার সভ্যদেরকে।

দেখুন! রাজা-বাদশা যে জনপদে প্রবেশ করে সেটা হয় তছনছ। সম্মানিত লোকেরা হয় অসম্মানিত ও অপমাণিত। তাদের কর্মকাণ্ড সব সময়ই হয় এ রকম। বরং তার কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাই। দেখি পাঠানো দূত কি জবাব নিয়ে আসে। রাণীর ধারণা ছিল বাদশাহ যদি হয় দুনিয়াদার। সানন্দে গ্রহণ করবে উপহার। দীনের স্বার্থে হলে করবে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান।

উপহার দেখেই বাদশাহ বীরোচিত ভঙ্গিতে বলে ওঠলেন। তোমরা কি উপহার দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে অনেক উত্তম জিনিস দিয়েছেন। তোমরা এগুলো নিয়ে সুখে থাকো। অচিরেই আমি সৈন্য পাঠাবো। যাদেরকে তোমরা মোকাবেলা করতে পারবে না। বাদশাহী অভিজ্ঞতা দিয়ে হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝালেন। রাণী বিলকিস প্রেরিত দূতদেরকে।

যেভাবে উপঢৌকন ফেরত দেয়া হলো তাতে সংঘাত অনিবার্য। চূড়ান্ত লড়াই অনিবার্য রূপ নিবে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে। আবার এও বুঝালেন বাদশাহ। রাণীর উপঢৌকন মানেই সন্ধি। দাওয়াত কবুলেরই ইঙ্গিত। হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষদকে বললেন এভাবে। তোমাদের মধ্যে কে

আছো এমন? রাণীর আত্মসর্পণের পূর্বেই তার সিংহাসন নিয়ে আসবে? জনৈক দৈত্য জিন বললো। অনুমতি দিন। আপনার ওঠার পূর্বেই আমি এনে দিবো। আমি এ কাজে যথেষ্ট সামর্থ্য ও বিশ্বস্ত।

উপস্থিত একজন মু'মিন ব্যক্তি বললো। আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বেই এনে দিচ্ছি আমি। চোখের পলকে রাণীর সিংহাসন দেখলেন হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শুকরিয়া আদায় করলেন আল্লাহর। শুকরিয়া আদায়কারী মূলত, নিজেরই উপকার করে। সিংহাসন এর রূপ সৌন্দর্যের পরিবর্তন করে বুদ্ধির পরীক্ষা নেয়া হলো রাণী বিলকিসের। উত্তীর্ণ হলেন তাতে রাণী বিলকিস।

রাণী বিলকিস ছিলেন অবিশ্বাসী। গায়রুল্লাহর ইবাদত ছাড়তে আহ্বান জানালেন হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম। স্বাগত জানালেন প্রাসাদে প্রবেশে। তার মনে হলো প্রাসাদ স্বচ্ছ জলাশয়। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পায়ের দিকের কাপড় উঁচু করে হেঁটে আসলেন তিনি। বুঝতে ব্যর্থ হলেন রাণী বিলকিস। কাঁচ নির্মিত প্রাসাদ হতে পারে এভাবে এতো সুন্দর ? রাজকীয় অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হলেন রাণী বিলকিস। বললেন দ্বিধাহীন চিত্তে। হে আমার প্রভু! নিজের উপর জুলুম করেছি নিজেই। আমি হযরত সুলাইমানের আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে স্বত্তা বিলীন করে আত্মসমর্পণ করছি। ঈমান এনে মুসলমান হলাম। যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের রব ও প্রতিপালক তাঁর কাছে। এভাবেই নতুন জীবন শুরু করলেন রাণী বিলকিস। যাকে খিদমত দিতো ৬০০ নারী। ছেড়ে দিয়ে রাজ্য শাসন ও মূর্তি পূঁজা। হয়ে গেলেন সাধারণ মানুষ, মুসলমান ও আল্লাহর গোলাম। *(সূরা সাবা অবলম্বনে)*

<u>প্রশ্ন</u>

১. হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছিলেন?

২. বিলকিস কোথাকার রাণী ছিলেন?

৩. কে কাকে চিঠি দিয়েছিলেন?

৪. কে কাকে উপহার দিয়েছিলেন?

৫. রাণীর সিংহাসন কে এনেছিলো ও কত সময়ে এনেছিলো?

জ্ঞানী পিতার জ্ঞানী পুত্র

হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বনি ইসরাইলের কাছে প্রেরিত একজন নবী।

মানুষের হিদায়াতের জন্য তাকে দেয়া হয়েছিলো আসমানি কিতাব। নাম তার যাবুর শরীফ। আসমানি কিতাবের আলোকে তিনি মানুষকে ডাকতেন। হিদায়াতের পথে। আলোর পথে। ডাকতেন আল্লাহর সু-মহান পথ ইসলাম ও সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে। মহান আল্লাহ দিয়েছেন তাকে অনেক মুজিযাহ বা কুদরতে ইলাহী। তার একটি হলো লোহার ব্যবহার। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম লোহাকে ব্যবহার করতেন তিনি। লোহাকে আগুনে গলিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার উপযোগী করতেন। লোহা দিয়ে বানাতেন যুদ্ধাস্ত্র। বানাতেন লৌহ-বর্মও। এভাবেই তিনি হলেন পৃথিবীর প্রথম ইঞ্জিনিয়ার।

পাহাড়-পর্বত। গাছ-পালা। পশু-পাখি । এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত অনুগত হয়েছিলো হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর। সু-মধুর কণ্ঠের অধিকারী

ছিলেন হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সু-মধুর ও সু-ললিত কণ্ঠে যাবুর তিলাওয়াত করতেন হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পাহাড়-পর্বতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো তাঁর তিলাওয়াত। থেমে যেতো পাখিদের কলকাকলী। পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ও পাখিদের থেকে আসতো তাসবীহর আওয়াজ। এসবই ছিলো মহান আল্লাহর কুদরত।

একদা ঘটে গেলো অন্য ঘটনা। হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন দু'জন ব্যক্তি। তাদের একজন ছিলো ফসলী জমির মালিক। অপরজন একপাল ছাগলের মালিক। দু'জনই এসেছিলেন একটি বিচার নিয়ে। জমির মালিক হলেন অভিযোগকারী কিংবা বাদী। আর ছাগলপালের মালিক হলেন অভিযুক্ত কিংবা বিবাদী। বাদীর অভিযোগ ছিলো। ছাগলের পাল নষ্ট করে ফেলেছে ফসলী জমির সকল ফসল। হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন বাদীর কথা। শুনলেন বিবাদীর কথাও। মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে। বাদীর করা অভিযোগ। তিল পরিমাণও। অস্বীকার করেননি বিবাদী।

এখন রায়ের পালা। রায় দিবেন হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি একজন মানুষ। মানুষ হিসেবে ইজতিহাদী রায় দিলেন তিনি। রায়টি হলো এমন। জিতে গেলো জমির মালিক। হেরে গেলো ছাগল পালের মালিক। ছাগল পাল দিয়ে দিতে হবে জমির মালিককে। কারণ ফসলের দাম ও ছাগল পালের দাম ছিলো সমান সমান। কাজেই ক্ষতিপূরণ আদায় হয়ে যাবে এর মাধ্যমে। রায়ের ফলে বাদী হলেন সম্পদশালী ও বিবাদী হলো নিঃস্ব।

বাদী এবং বিবাদী বের হয়ে যাচ্ছেন। হযরত দাউদের আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদালত থেকে। দরজায় দেখা তাদের সাথে হযরত সুলাইমানের আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হযরত দাউদের আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুত্র। আল্লাহর একজন নবীও ছিলেন তিনি। নবীর পুত্র নবী। হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন রায় সম্পর্কে। রায় শুনলেন তিনি বাদী-বিবাদীর কাছ থেকে। রায় শুনে তিনি বিব্রতবোধ করলেন। বললেন আমি রায় দিলে হতো অন্য রকম। তাতে উপকৃত হতো দু'জনই।

হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হলেন। পিতা দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে। তাঁকে জানালেন তিনি এ ঘটনা। হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন প্রিয় পুত্রকে। আমার দেয়া রায় থেকে উত্তম এবং উপকারী রায় তাহলে কোনটি? হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে বললেন। আপনি ছাগলের পাল জমির মালিককে দিন। জমির মালিক ছাগলের দুধ ও পশম দিয়ে উপকৃত হোক। আর ফসলের ক্ষেত দিন ছাগলের মালিককে। সে পরিচর্যা করুক ফসলের ক্ষেত। ফসল যখন আগের অবস্থানে ফিরে যাবে তখন ফসলের ক্ষেত দিবেন জমির মালিককে। আর ছাগলের পাল ফেরৎ দিবেন ছাগলের মালিককে। ক্ষতি হবে না কারোরই। পরিপূর্ণ ইনসাফ করা হবে দু'জনের ওপরই।

রায়টা পছন্দ করলেন হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বেজায় খুশি হলেন তিনি। দু'য়া করলেন আল্লাহর কাছে। প্রিয় পুত্র হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য। ডাকলেন বাদী এবং বিবাদীকে। বাতিল করলেন আগের রায়। রায় দিলেন পরিবর্তন করে। কার্যকর করলেন হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রস্তাবিত রায়। খুশি হলেন বাদী-বিবাদী দু'জনেই। এভাবেই আল্লাহর নবীরা সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন। আর স্বীকার করেন ইজহিতাদী ভুল। একগুঁয়েমিভাব থাকলো না কারো মধ্যে। ইসলামের শিক্ষা হয় এমনই। এ যেন জ্ঞানী পিতার জ্ঞানী পুত্রের উপমাই বটে।
(সূরা আম্বিয়া অবলম্বনে)।

প্রশ্ন

১. হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আসমানি কিতাবের নাম কী ছিলো?
২. হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে সম্পর্ক কী ছিলো?
৩. আগের রায়ে কী ভুল ছিলো?
৪. কারা হযরত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিলাওয়াত শুনতেন?
৫. আগের রায় কেন বাতিল হয়ে যায়?

দু'টি বাগানের অহংকারী এক মালিক

অনেক অনেক দিন আগের কথা।

দু'জন বন্ধু এক সঙ্গে বসবাস করতেন। তারা ছিলো একে অপরের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনে হতো একে অপরের ছবি। তবে কিছু পার্থক্যও ছিলো। একজন ছিলো বেশ সম্পদশালী। প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী। সবুজ শ্যামল সতেজ সুজলা-সুফলা ফল মূলে ভরা শস্য ক্ষেতের মালিক। তাও আবার একটি নয়। দু'টি বাগানের মালিক।

পক্ষান্তরে তারই সাথী অপর বন্ধুটি ছিলো বিত্তহীন। কিন্তু বিত্তহীন হলে কি হবে? ঈমানী চিত্ত ছিলো তার। তাওহীদের আলোয় আলোকিত ও কানায় কানায় ভরপুর। আল্লাহর স্মরণে সদা মশগুল ছিলো সে। সর্বাবস্থায় থাকতেন কুফর ও ঈমান বিধ্বংসী কর্মতৎপরতা থেকে দূরে। বহু দূরে। তার বন্ধুর মত হতোনা অহংকারী। দেখায় না বাহাদুরি ধন-দৌলত ও শান-শওকতের। ভুলে যায়না মহান আল্লাহর শক্তির কথা। ভুলে যায়না জীবন মৃত্যুর কথা। সম্পূর্ণ এক ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিলো তাঁর।

অহংকারী লোকটির দু'টি বাগানই ছিলো চোখ জুড়ানো ও মনভুলানো। প্রায় সব খেজুর গাছ দ্বারা ছিলো পরিবেষ্টিত। দু'বাগানের মাঝেই ছিলো চমৎকারিত্বের লীলাভূমি। নয়নাভিরাম সবুজ শ্যামল শস্যক্ষেত। উভয় বাগানই ছিলো যেমন ফলে ফুলে ভরপুর। তেমন ফাঁকে ফাঁকে ছিলো প্রবাহিত স্রোত ধারা। যেন জান্নাতি নহর।

একদিন। ফলবাগানের মালিক পাকা টসটসে ফল সংগ্রহ করতে গেলো। কথা প্রসঙ্গে তার সাথীকে অহংকার

প্রকাশ করতে গিয়ে বললো। আমার ধন-সম্পদ তোমার চেয়ে অনেক বেশি। জনবলেও আমি বেশ শক্তিশালী। অহংবোধে ফুলেছেন। জমিনে যেন তার পা পড়েনা। এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করতে করতে সে বাগানে প্রবেশ করলো।

সে আরও বললো। আমার মনে হয় না। এ বাগান কখনো ধ্বংস হবে। কখনো কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি কখনোই বা হয় এবং প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে যাই। তাহলে সেখানেও এর চেয়ে ঢের বেশি বস্তু পাবো। এভাবেই বাগান মালিক তার দাম্ভিকতার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবার পরও হত দরিদ্র ও ক্ষুধাপীড়িত ঈমানের বলে বলীয়ান সাথী কখনো ছোট কিংবা দুর্বল মনে করেনি নিজেকে। প্রতিপালকের মর্যাদা ও সম্মানের কথা ভুলে যায়নি সে স্বল্প সময়ের জন্যও। সাহসের সাথে অহংকারী বাগান মালিককে স্মরণ করিয়ে দিলো তার সৃষ্টির ইতিহাস।

সে তাকে বললো। তোমার অহংকার তো নিরর্থক ও সম্পূর্ণ বেমানান। তুমি আল্লাহকে কেনো অস্বীকার করছো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর নাপাক পানি থেকে। তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন কতোইনা সুন্দর মানব আকৃতিতে? আমিতো শুধু এ কথাই বলি। মহান আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা। তাঁর সাথে আর কাউকে পালনকর্তা মানি না। আর জেনে রাখো। সত্যিকার অর্থেই যদি তুমি আমাকে মনে করো ধনে ও জনে তোমার চেয়ে কম। কিংবা মনে করো দুর্বল। তাহলে বাগানে প্রবেশ করার সময় কেন বলোনা মা-শা-আল্লাহ। লা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ। মানে আল্লাহ যা চান তাই হয়। আল্লাহর শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই।

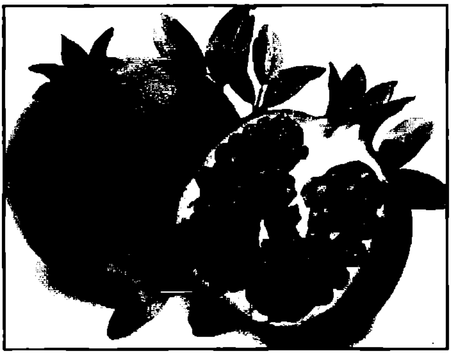

আমি আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উত্তম বস্তু দান করবেন। মনে রেখো! তোমার বাগানের ওপর আসমান

থেকে আগুন পাঠাবেন। ফলে সকালে তা পরিষ্কার মাঠ হয়ে যাবে। অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি তার সন্ধান পাবে না।

এভাবেই অহংকারী বন্ধু যখন গর্বে তার পা মাটিতেই ফেললো না। ব্যর্থ আস্ফালন করতে উদ্যত হলো। যখন ঈমানদার সাথী। ঈমানী শক্তির বলিষ্ঠতা দিয়ে তাকে সৃষ্টির রহস্য স্মরণ করিয়ে দিতে ব্যর্থ হলো। তখন তিনি রাগে-ক্ষোভে বদদু'আ করে পৃথক হয়ে গেলেন।

পরিশেষে দেখা গেলো, মহান আল্লাহ মু'মিন ব্যক্তিটির দু'য়া কবুল করেছেন। তার সমস্ত ফল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বাগানের ব্যয় করা সম্পদের জন্য সকাল বেলা দু'হাত কঁচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগলো। অস্থির হয়ে পড়লো। টানতে লাগলো মাথার চুলও। সম্পূর্ণ বাগান পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য।

সে বলতে লাগলো হায়! আমি যদি পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক না করতাম। তাঁর শুকরিয়া আদায় করতাম। তাঁর শক্তির গুরুত্ব দিতাম এবং অহংকার থেকে মুক্ত থাকতাম। তাহলে আমার এ সর্বনাশ হতোনা। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত। কৃতকর্মের জন্য পরে অনুশোচনা না করে পূর্বেই সতর্কতার সাথে কাজ করা। আল্লাহকে ভুলে না যাওয়া। মনের ভুলেও অহংকারী না হওয়া। *(সূরা আল কাহাফ অবলম্বনে)*

__প্রশ্ন__

১. বাগান মালিক কিসের জন্যে অহংকার করেছিলো?

২. বাগান মালিক বাগানে প্রবেশ করে কি বলেনি?

৩. বাগান মালিকের গরিব বন্ধুর কিসের শক্তি ছিলো?

৪. মানুষকে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন?

৫. গরিব বন্ধু বাগান মালিককে কি বদ-দোয়া করেছিলেন?

কী কারণে জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যা শিশুদের

বিশ্বের মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশ।

তার মধ্যে একটি দেশ। নাম তার আরব। বলা হয় জাজিরাতুল আরব। মরুভূমি আর মরুভূমি। ধু-ধু বালুতে পাহাড় আর পাহাড়। সেখানকার মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্টে যেমন ছিলো আতিথেয়তা। সাহিত্য প্রেম ও কবিতা চর্চা। তেমন তাদের ছিলো লুটতরাজের মত ঘৃণ্য পেশা। খুন-খারাবি, যুদ্ধ-বিগ্রহকে বলা যায় এটা ছিলো তাদের নেশা। তাদের যতগুলো খারাপ ও অসৎ গুণাবলী ছিলো, তার মধ্যে অন্যতম ছিলো কন্যা সন্তান হত্যা করা কিংবা জীবন্ত কবর দেয়া।

তাদের এ অনৈতিক কাজকে বৈধতা দানের জন্য কিছু খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করতো তারা। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা, শত্রু পক্ষের বাদি বানানো অথবা বিক্রি করা। এসব ঠুনকো অজুহাতে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে গর্তে ফেলে মাটি চাঁপা দেয়া হতো। এ ঘৃণ্য কাজটি আরব সমাজে ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

আরবের মেয়ে সন্তানদের প্রতি এ নির্মম ও নিষ্ঠুর এবং নির্দয় ব্যবহারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন হাদিসে। জনৈক সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করেছেন এভাবে। হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান ছিলো। সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। আমি নাম ধরে ডাকলে দৌড়ে কাছে আসতো। গলা জড়িয়ে ধরতো। একদিন আমি তাকে কাছে ডাকলাম। মেয়েটি কাছে আসলো। তাকে নিয়ে হাত ধরে হাঁটতে লাগলাম। পথে একটি কূপ দেখে দু'হাত ধরে তাকে কূপের মধ্যে ছুড়ে মারলাম। তার শেষ কথাটিও কানে ভেসে এলো। হায় আব্বা! হায় আব্বা!

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর কথা শুনলেন। কেঁদে কেঁদে অশ্রু ঝরালেন অবিরামভাবে। একজন সাহাবী তাকে ধমক দিলেন। বললেন তুমি কেন আল্লাহর নবীকে কাঁদালে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বলতে দাও। মনের কোনে জাগ্রত অনুভূতির কথা। তিনি আবার বললেন। দয়াল নবী হাউমাউ করে শিশুর মতো কাঁদলেন। প্রিয় নবীর দাড়ি ভাসালেন চোঁখের পানিতে। তারপর বললেন, জাহেলি যুগের সবকিছু আল্লাহ মাফ করেছেন। এখন তুমি নতুন জীবন শুরু করো।

সবাই যে কন্যা শিশু কবর দিতো বিষয়টি কিন্তু ঠিক তা নয়। আরবের বিখ্যাত কবি ফারাজদাকের দাদা সা'সা ইবনে নাজীয়াহ আল মুজাশেঈ তিনশত ষাটটি কন্যা সন্তান রক্ষা করেছেন। সাতশত বিশটি উটের বিনিময়ে। এতে প্রমাণিত হয়, অর্থ কষ্টের ভয়েই মানুষ এ কাজটি বেশি করতো। যে কারণেই করা হোকনা কেনো। কাজটি খুবই গর্হিত ও নিন্দনীয়। মানবতা বিরোধী, হৃদয়বিদারক এবং লোমহর্ষক। আর এ অমানবিক কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েই মহান আল্লাহ বলেছেন। যখন মহাপ্রলয়ের কিয়ামত সংঘটিত হবে। ভয়াবহ ও ভীতিকর সেই দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। জাহেলি যুগের সেই কুকর্ম সম্পর্কে? কোন অপরাধে আর কোন দোষে? মহান আল্লাহর সুন্দর সৃষ্টি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো ?

মহান আল্লাহ বেশ ক্রোধের সাথে উল্লেখ করেছেন। হীন কাজের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। বিষয়টি নিন্দার মধ্যেই শেষ করেননি। যদি শক্তি ও

সাহস থাকে। প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান ও জানিয়েছেন দৃঢ়ভাবে। আসলে মানুষ বড়োই দুর্বল ও অসহায়। এসবের উত্তর দেয়ার শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের একদম নেই। আর যদি না-ই থাকে তাহলে বিরত থাকাই সমীচীন।

আল্লাহর সৃষ্টি সংরক্ষণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কন্যা সন্তান হচ্ছে মানব বংশ বৃদ্ধির মাধ্যম। আগামী দিনের সুন্দর প্রজন্মের উন্নত মানের ইউনিভার্সিটি। যারা হাজারো কষ্টের পর দুনিয়ায় আনেন সুন্দর সমাজ নির্মাতাদের। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মায়ের পদতলেই সন্তানের জান্নাত। দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালনকারী পিতা থাকবে জান্নাতে প্রিয় নবীর সাথে। যেমন থাকে দু'টি আঙ্গুল একসাথে একত্রে। এভাবেই জাহেলি যুগের কন্যা সন্তান হত্যা করা। জীবন্ত কবর দেয়া। আর সকল ধরনের কু-প্রথার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। নির্মূল করা হয়েছে চিন্তা চেতনাও। বিপরীত পক্ষে ইসলামের শিক্ষা, মেয়েদের লালন-পালন করা। উত্তম শিক্ষা প্রদান করা। সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করা। সংসারের কাজে পারদর্শী করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে দারুণভাবে। বিশ্ব দরবারে নারীর মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম দিয়েছে এ মর্যাদা। এটা আজ সর্বজন স্বীকৃত। *(সূরা তাকভীর অবলম্বনে)*

প্রশ্ন

১. কন্যা সন্তানকে কারা জীবন্ত হত্যা করতো?

২. একজন সাহাবীর বর্ণনা করা ঘটনাটি কী ছিলো?

৩. কে তিনশত ষাটটি কন্যা রক্ষা করেছিলেন?

৪. সাহাবীর বর্ণনার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করেছিলেন?

৫. ইসলাম নারীদের কী মর্যাদা দিয়েছেন?

হযরত আইউব আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ ও তাঁর ধৈর্য

পাহাড় সম বিপদ-মুসিবত।

আকাশ সম ধৈর্য। এ গুণটি একজন মু'মিনের।

একজন মুসলমানের। একজন আল্লাহর নবীর। আল্লাহর প্রিয় এ নবীর নাম হযরত আইউব আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনিও ছিলেন বনি ইসরাইলের একজন নবী। তিনি এসেছিলেন বর্তমান ফিলিস্তিনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর। উত্তর আরবের অধিবাসীদের নিকট। দিচ্ছিলেন দীনের দাওয়াত। তিনি বেঁচে ছিলেন দুইশত দশ বছর। মুখোমুখি হয়েছিলেন আল্লাহর পরীক্ষার। যেভাবে হয়েছিলেন অন্যান্য নবীগণ।

হযরত আইউবের আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরীক্ষা ছিলো অন্যরকম। তবে মনে হয় একটু বেশি। তাকে আল্লাহ দিয়েছিলেন প্রচুর ধন-সম্পদ। সন্তান-সন্ততি এবং দাস-দাসীও ছিলো বেশ। ছিলো বাগবাগিচা ও ফল-ফলাদির ক্ষেত-খামার। ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো তার সকল সহায়-সম্পত্তি। সবকিছু ধ্বংস হলো। তিনি হয়েছিলেন অসুস্থ। গুরুতর অসুস্থ। হয়েছিলো কুষ্ঠ রোগ। পচন ধরেছিলো সারা শরীরে। সে কি পচন! তার কাছ থেকে সটকে পড়েছিলো আত্মীয়স্বজন। পাড়া প্রতিবেশী। ছেলে-সন্তান এমনকি স্ত্রীরাও। রয়ে গিয়েছিলো একমাত্র প্রিয়তমা স্ত্রী ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ।

ঈমানের দাবী অনুযায়ী হযরত আইউব আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ধৈর্যহারা হননি। হননি বিচলিত এবং ভড়কে যাননি তিল পরিমাণও। সাহস হারাননি সামান্যতম। সরে যাননি আল্লাহর স্মরণ থেকে এক মূহূর্ত। তার পুরো অঙ্গ-প্রতঙ্গ এতটাই পচেছিলো বাকি ছিলো শুধু মাত্র জিহ্বা এবং অন্তর। আর এ দিয়েই তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান, আবিদ, জাকির ও সাকির।

একদিন তার প্রিয়তমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ আরজ করলেন। ওহে, প্রিয়তমা স্বামী! আপনি তো আল্লাহর নবী। আল্লাহর কাছে একটু সাহায্য চান। আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনার কষ্ট বেড়ে গেছে

অনেক। আপনার কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনার দোয়া কবুল করবেন। তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। করবেন রোগমুক্ত। হয়ে ওঠবেন সুস্থ।

হযরত আইউব আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন স্ত্রীকে। আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ ছিলাম। মহান আল্লাহর প্রচুর নিয়ামত ভোগ করেছি। দীর্ঘ সত্তর বছরের বিপরীতে মাত্র সাত বছর অসুস্থ। এ আমার জন্য এতো কঠিন হবে কেন? ধৈর্য হারাবার কী আছে? নবীর দৃঢ়তা দেখে হতবাক হন প্রিয়তমা স্ত্রী। থেমে যান তিনি। সরে আসেন তার আবদার থেকে।

আল্লাহর নবী সাহস করতেননা আল্লাহর কাছে রোগ মুক্তির দোয়া করতে। বিষয়টি ধৈর্যের খেলাফ হয় কিনা এমনটি ভেবে। তারপর তিনি একদিন । অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সুলভভাবে। কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করলেন এভাবে। হে আমার প্রতিপালক ! আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমাকে বেশ দুঃখ কষ্ট পেয়ে বসেছে। আপনিতো সবচেয়ে বেশি দয়াবান। এরকম আবেগপূর্ণ অথচ সম্পূর্ণ গোলামী আহ্বান। করুণার সৃষ্টি হলো দয়াবান আল্লাহর দয়ার দরিয়ায়। সৃষ্টি হলো মহব্বতের ঢেউ।

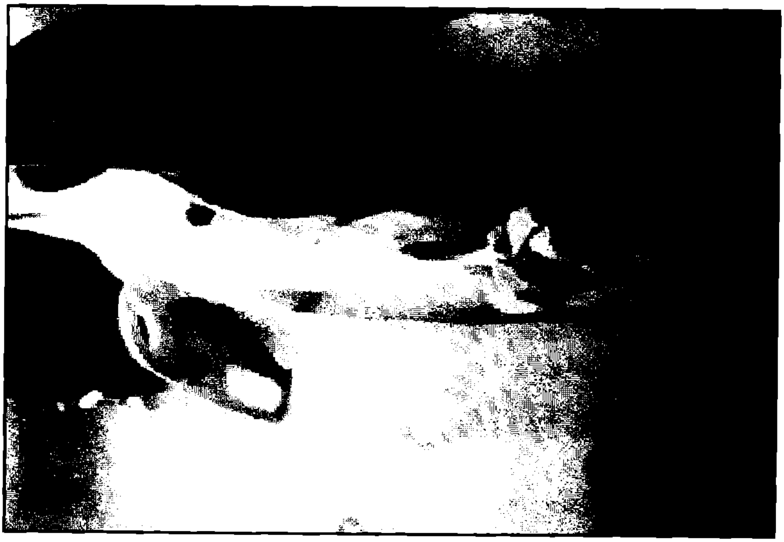

আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীর আহ্বানে সাড়া দিলেন। নবী হযরত আইউব আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ্ বললেন। হে আইউব! তোমার পায়ের গোড়ালী দিয়ে আঘাত করো মাটিতে। হযরত আইউব আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে তাই করলেন। আঘাত করায় ঝর্ণাধারা সৃষ্টি হলো পায়ের কাছে। সৃষ্টি হলো ঝর্ণা । সুশীতল পানির ঝর্ণা। গোসল আর খাওয়ার জন্য। তিনি গোসল দিলেন এবং পান করলেন। এটিই ছিলো তাঁর রোগমুক্তির মহা ঔষধ। দূর হয়ে গেলো তাঁর দুঃখ-কষ্ট। রোগ থেকে পেলেন মহামুক্তি।

শুধু রোগমুক্তিই নয়। তাকে আবার ফিরিয়ে দেয়া হলো পরিবার পরিজন। পাড়া-প্রতিবেশী। আত্মীয়স্বজন। ফিরে পেলেন সহায় সম্পদ। কাছে ভিড়লো বন্ধু-বান্ধব। বৃদ্ধি পেলো আরো সন্তান-সন্ততি। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ শিক্ষা দিলেন মুসলিম উম্মাহকে। পরিবার-পরিজন। সন্তান-সন্ততি। অর্থ-বিত্ত ও সুন্দর স্বাস্থ্য সবই মহান আল্লাহর অপূর্ব নিয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রচুর পরিমাণে দান করেন। আবার ছিনিয়েও নেন। এটা শুধু মাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব।

আর পরীক্ষা করেন কে ধৈর্যশীল? কে শোকর আদায়কারী? কে হতাশাগ্রস্ত ? আবার কে হয় নাফরমান? কে থাকবে বিপদে-আপদে কাছে? কে সরে যাবে দূর থেকে বহু দূরে? তা প্রমাণ হয়ে যাবে বিপদ মূহূর্তে? এটাই আল্লাহর শিক্ষা। (সূরা সা'দ অবলম্বনে)।

প্রশ্ন

১. হযরত আইউব আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছিলেন ?

২. আল্লাহ তাকে কী পরীক্ষায় ফেলেছিলেন?

৩. কারা তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো?

৪. হযরত আইউবের আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে থাকা স্ত্রীর নাম কী ছিলো?

৫. মহান আল্লাহ হযরত আইউবকে আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে সুস্থ করলেন?

অল্প ভুলের খিসারত হলো অনেক

হিজরি তৃতীয় সাল।

শাওয়াল মাস। গত বছরের আনন্দের রেশ এখনো কাটেনি।

সে আনন্দ ছিলো বিজয়ের। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের। মক্কায় কুরাইশদের শক্তির দাপটের পরাজয়ের। বিষাদ আর দুশ্চিন্তা ঘিরে ফেললো আল্লাহর রাসূলকে। মক্কার কুরাইশরা আক্রমণ করে বসলো মদিনা। প্রায় তিন হাজার সৈন্য। সংখ্যায় অনেক বেশি। অস্ত্রশস্ত্রও আছে বেশ। মাথায় তাদের প্রতিশোধের স্পৃহা। বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ করলেন। বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে। সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো প্রতিরোধ লড়াই চালাবেন তারা। মদিনায় বসে। আত্মরক্ষামূলকভাবে।

বাঁধ সাধলেন তরুণ সাহাবীরা। যারা যেতে পারেনি বদরের যুদ্ধে। শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খায় তারা ছিলো বিভোর। বায়না ধরলেন তারা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে। যুদ্ধ করতে হবে মদিনার বাইরে গিয়ে। তরুণ

সাহাবীদের পীড়া-পীড়িতে রাজী হলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। যুদ্ধ করবেন মদিনার বাইরে গিয়ে। বেরিয়ে পড়লেন এক হাজার সৈন্য নিয়ে। এগিয়ে চললেন তিনি। পৌঁছালেন মদীনার অদূরে শওত নামক স্থানে।

মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। রণ ভঙ্গ দিলো তার অনুসারী তিন শত সৈন্য নিয়ে। যুদ্ধ শুরুর আর মাত্র অল্প সময় বাকী। অস্থিরতা আর হতাশা ঘিরে ধরলো মুসলিম সেনা শিবিরে। বনু সালমা ও বনু হারেসার লোকেরা হতাশ হলো বেশি। ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো তারাও। দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়ী সাহাবীরা চেষ্টা চালালেন। জোর প্রচেষ্টা। দূর হলো হতাশা আর মানসিক অস্থিরতা। বাকী সাত শত সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। মদিনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে।

উহুদ পর্বতের পাদদেশে। পাহাড় রাখলেন পিছন দিকে। আর কুরাইশ সেনা দল সামনের দিকে। পাশের গিরিপথে পঞ্চাশ জন দিলেন তীরন্দাজ যোদ্ধা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে। সেনা সদস্যদের সুবিন্যস্ত করলেন আল্লাহর রাসূল এভাবে।

গিরিপথ দিয়ে আচমকা হামলার আশংকা ছিলো প্রবল। তাদের নির্দেশনা দেয়া হলো শক্ত করে। 'কাউকে আমাদের কাছে আসতে দেবেনা। কোনো অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবেনা। তোমরা যদি এটাও দেখো। পাখি আমাদের মগজ খাচ্ছে। তারপরও তোমরা স্থান ত্যাগ করবেনা।' বাজলো দামামা। যুদ্ধ হলো শুরু। বিজয়ের পথে এগুতে থাকলো মুসলমানরা। পরাজয়ের দিকে মুশরিকরা। ছিন্ন-ভিন্ন হতে লাগলো তারা। মুশরিক সৈন্য শিবিরে চরম বিশৃঙ্খলা। মুশরিক সৈন্যদের পলায়নপর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। চূরান্ত বিজয়ের পূর্বেই লোভাতুর হলো কতিপয় মুসলমান। শুরু করলো সৈন্য শিবিরে গণিমত আহরণ করতে। অংশগ্রহণ করলো গিরিপথ

হিফাজতের দায়িত্বে থাকা তীরন্দাজরা। বাধা দিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর। শুনালেন আল্লাহর রাসূলের কড়া নির্দেশনা। কে শুনে কার কথা? মানলেন না অনেকেই। ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা। গণিমতের সম্পদের মোহে। এ যেন এক সমূহ বিপদেরই মহড়া।

কাফির কমান্ডার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ পেলো মহাসুযোগ। সে করলো সুযোগের সদ্ব্যবহার। গিরি পথ দিয়ে প্রবেশ করলো সৈন্য নিয়ে। হঠাৎ আক্রমণ। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের স্বল্প সৈন্যের বাঁধা কাজে আসলোনা কোনো। পাল্টা আক্রমণ! সামাল দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। পলায়নপর কাফের সৈন্যরা পেলো শক্তি। মনে হলো সাহসের সঞ্চার। ঘুরে দাঁড়ালো তারা। মুসলমানরা হলো চতুরমুখী হামলার শিকার। বদলে যায় যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা।

হঠাৎ করেই যুদ্ধের মুখোমুখি হয় মুসলমানরা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতচকিত হয়ে পড়ে তারা। পরাজয় আঁচ করে সাহস হারিয়ে ফেলে কিছু মুসলমান। দান্দান মুবারাক শহীদ হয় রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পড়ে যান তিনি গর্তের মধ্যে। কতিপয় সাহাবী মানব প্রাচীর রচনা করে রক্ষা করেন আল্লাহর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গুজব ছড়িয়ে পড়ে সবখানে আল্লাহর রাসূল নেই দুনিয়ায়। চলে গেছেন আল্লাহর কাছে। এখন কি হবে আমাদের? প্রশ্নের সৃষ্টি হলো মুসলমানদের মনে। টুকরো টুকরো হলো আত্মবিশ্বাস। বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সাহাবীরাও হলেন দুর্বল। ভেঙ্গে গেলো তাদের মনোবল। তারাও হলো হতবিহ্বল। পরাজয়ের যখন শেষ প্রান্ত সীমা। মুসলমান সৈন্যরা জানালেন শহীদ হয়নি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জীবিত আছেন তিনি। প্রাণ পেলেন সাহাবারা। ছুটে এলেন সবাই। রাসূলকে সরিয়ে নিলো নিরাপদ পর্বত চূড়ায়। নব প্রাণ আর নতুন উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ালো মুসলমানরা। চললো তুমুল যুদ্ধ। কাফেররা দিলো রণভঙ্গ। শেষ হলো যুদ্ধ। কাফেররা চলে গেলো মক্কায়।

এভাবেই নির্ধারণ হলো কাফের ও মুসলমানদের জয় পরাজয়। মুসলমানদের নেতার নির্দেশ না মানা ও লোভের কারণেই নেমে এলো সাময়িক বিপর্যয়। এভাবেই ইতিহাস স্বীকার করলো। মুসলমানদের বিপর্যয় এলো মুসলমানদের কারণে। অল্প ভুলের খিসারত হলো অনেক। *(সূরা আলে ইমরান অবলম্বনে)।*

প্রশ্ন

১. উহুদ যুদ্ধ কত হিজরীর কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো?
২. গিরি গুহায় কতোজন ও দায়িত্ব প্রাপ্ত সাহাবীর নাম কী ছিলো?
৩. মুসলমানদের বিপর্যয় কেন হলো? কী অন্যায় করেছিলো তারা?
৪. উহুদ যুদ্ধে মুসলমান ও কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো কতোজন?
৫. মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কী করেছিলো?

কর্মচঞ্চল এক নবীর কাহিনি

চঞ্চল। দারুণ চঞ্চল।

কর্মচঞ্চল এক নবী। নাম তার হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের নবী। তাকে সিন্দুকে করে, ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো নীল নদে। ফিরআউনের দরবারে। লালিত পালিত হয়েছিলো ফিরআউনেরই প্রাসাদে। টগবগে ভাব আর ত্বরিত কাজ। বেশ চটপটে। তার চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুঠাম ও সবলদেহ। যৌবনে পদার্পণ। একদিন প্রবেশ করলো শহরে। খুব সকালে। অতি প্রত্যুষে। লোকেরা তখন ছিলো ঘুমের ঘোরে বিভোর। অচেতন ও বেখেয়াল। দেখতে ছিলেন তিনি। লড়াই করছে দু'যুবক। একজন নিজ বংশীয় বা নিজ জাতির। অপর জন কিবতী।

নিজ জাতির লোকটি দৌড়ে আসলো। সাহায্য চাইলো কিবতীকে ঘায়েল করার জন্য। উতলে উঠলো হযরত মুসার আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতিপ্রীতি। প্রতিভাত হলো তার কর্মচঞ্চলতা। এগিয়ে গেলেন সাহায্যের জন্যে। কিবতীয় যুবককে মারলেন স্বজোরে ঘুষি। ঘুষি খেয়ে পড়েই মরে গেলো যুবকটি। হতচকিত হয়ে গেলো হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাথে সাথে বলে ফেললেন তিনি। এটা তো আমার নয়। অভিশপ্ত শয়তানের কাজ। আর সে তো প্রকাশ্য দুশমন।

চেতনাবোধের জন্ম হলো তাঁর। বললেন সবিনয়ে মহান আল্লাহর কাছে। হে আমার প্রতিপালক! আমিতো জুলুম করেছি! নিজের ওপর নিজেই। আমি তাওবাহ করছি। আমাকে ক্ষমা করো। আল্লাহ্ তাওবাহ কবুল করে ক্ষমা করলেন তাকে। মহান আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কৃতজ্ঞতা চিত্তে অঙ্গীকার করলেন তিনি। আর কখনো হবোনা অপরাধীদের সাহায্যকারী। হত বিহ্বল। ভীত সন্ত্রস্ত। তাকালেন এদিক সেদিক। ঘাবড়ে যেয়ে পথ চলতে চলতে চলে গেলেন আপন মনে।

অন্য আরেক দিন। লোকালয়ে অতি প্রত্যুষে। হঠাৎ চেচামেচি আর চিৎকার। শব্দ শুনলেন হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কাছে গিয়ে দেখলেন।

গতকালের ব্যক্তিই সাহায্য প্রার্থনা করছে। হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তো প্রকাশ্য ও পথহারা ব্যক্তি। তার পরও হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন তাঁর প্রতিশ্রুতি ও দরবারে ইলাহীতে ক্ষমা চাওয়ার কথা। কারণ তিনি তো কর্মচঞ্চল। ছুটে গেলেন সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তির কাছে। পুনরাবৃত্তি করতে চাইলেন আগের ঘটনা।

আক্রান্ত ব্যক্তি বললো, হে হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো। তার মতো কি তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও? তুমিতো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চলছো। তুমি কি সংশোধনকারী হতে চাওনা? এমন সময় দৌড়ে এসে এক ব্যক্তি বললো। হে হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাও। হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। দীর্ঘ সময় পার করলেন তিনি। বয়স বেড়েছে। কর্মচঞ্চলতা কমেনি। একদম কমেনি। পরিবর্তন হয়নি ফিতরাতের।

হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুখোমুখি। দেশের শ্রেষ্ঠ সব যাদুকরদের। আল্লাহ নির্দেশ দিলেন। হে মুসা! নিক্ষেপ করো তোমার লাঠি। হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিক্ষেপ করলো তার লাঠি। পরিণত হলো চলমান সাপে। সেকি দৌড়! হযরত মুসার আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভো-দৌড়। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগলেন তিনি। একবার তাকালেনও না। পিছনে তাকিয়ে দেখার সময় কোথায় তার? সেখানে কী ঘটেছে তাও দেখার সময় নেই তার। কর্মচঞ্চলতার ছাপ রাখলেন এখানেও সুস্পষ্টভাবে। সাপ খেয়ে ফেললো সব ফিরআউনী যাদুকরদের যাদু। বিজয়ী হলেন হযরত মুসা (আ.)।

বনি ইসরাইলদের ওপর ফিরআউনের নির্যাতন। উদ্ধার করলেন মহান আল্লাহ। পার করে দিলেন সমুদ্র। নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে। ডুবিয়ে মারলেন। নাকানি-চুবানি খাওয়ালেন। ফিরআউন ও তার দলবলকে। নির্দিষ্ট সময়ে হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছলেন তুর পাহাড়ে। নবুয়াতের কল্যাণ লাভের আশায়। সেখানে যেয়েও রাখলেন চঞ্চলতার ছাপ। ধরলেন এক আজব বায়না। প্রভু হে! দেখা দাও আমাকে। আমি দেখবো তোমাকে। আল্লাহর সাফ জবাব। তুমি আমাকে দেখতে পারবে না কখনো। তবে পাহাড়ের দিক চেয়ে থাকো। আর দাঁড়িয়ে থাকো নিজ যায়গায়। দেখতে পাবে আমার নিদর্শন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজস্ব আলোর বিকিরণ ঘটালেন। পাহাড়ের ওপর। ধ্বসে পড়লো পাহাড়। জ্ঞান হারালেন হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্বিত ফিরে পেয়ে হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। হে পরোয়ারদেগার! তুমিই পবিত্রতম সত্তা। তোমার কাছেই করছি তাওবাহ। সবার আগেই তোমার প্রতি আনলাম ঈমান।

পাহাড় থেকে ফিরে এলেন হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দেখলেন জাতির লোকেরা করছে বাছুর পূজা। হাতে রাখা আসমানী কিতাব তাওরাতের তখতি ফেলে দিলেন মাটিতে। চিন্তা করলেন না মোটেও এ যে আল্লাহর দেয়া পবিত্র বাণী। ভাইয়ের কথা না শুনেই অস্থির চিত্তে। হযরত হারুনের আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি ধরে করলেন টানাটানি। পরে ঠিক বুঝলেন এটা করেছে বাছুর পূজক সামেরী। এভাবে হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচিত হয়ে আছেন। সদা তৎপর, অস্থির কর্মচঞ্চল নবী হিসেবে। ইসলামের ইতিহাসে।

(সূরা ক্বাসাস ও আ'রাফ অবলম্বনে)

<u>প্রশ্ন</u>

১. হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে লোকটাকে হত্যা করলো?

২. হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লাঠি আল্লাহর নির্দেশে কী হলো?

৩. আল্লাহ কিভাবে বনি ইসরাইলকে রক্ষা করলেন?

৪. নবুয়াতের জন্য হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় গেলেন?

৫. হযরত মুসার আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নযিলকৃত ছহিফার নাম কি?

মাছওয়ালা নবী হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহর একজন নবী। হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা।

আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আসলেন মসুল এলাকায়। নিনেভাবাসীদের কাছে। তারা ছিলো কাফির ও মুশরিক। অস্বীকার করতো আল্লাহকে। করতো মূর্তি পূঁজা। হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্বান জানালেন। নিনেভাবাসীদের লা-শরীক এক আল্লাহর তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার জন্য। অনুরোধ করলেন ছেড়ে দিতে মূর্তিপূজা। নিনেভাবাসী প্রত্যাখ্যান করলো। হযরত ইউনুসের আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত। তাকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দিলো। হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছেন। খুব একটা কাজ হলোনা। তার কথা শুনতেও চায়না তার জাতির লোকেরা। মানা তো দূরের কথা।

জাতির লোকদের অবাধ্য কার্যকলাপে বিরক্ত হলেন হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হলেন ধৈর্যহারা। আল্লাহর নির্দেশনা ছাড়াই তিনি ঘোষণা করলেন। হে নিনেভাবাসী! তোমাদের কৃতকর্মের ফল পাবে। বুঝবে মজা। মুখোমুখি হবে ভয়াবহ আযাবের। অপেক্ষা করো এ আযাব আসবে আগামী তিন দিনের মধ্যে।

এক দিন গেলো। দু'দিন গেলো। বিপদ আসছেনা নিনেভাবাসীদের ওপর। অস্থির হলেন হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। হিজরত করবেন অন্য কোথাও। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়াই এলাকা ছাড়লেন।

সমূহ বিপদ ভেবে। লোক লজ্জার ভয়ে। এক লক্ষ বা তার চেয়ে বেশী। নিনেভায় বসবাসকারী লোক। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে বেড়িয়ে এলেন ময়দানে। করলেন তাওবাহ। খুঁজছেন তাদের নবীকে। মহান আল্লাহর হলো দয়া। মাফ করলেন তাদেরকে। সবাই আনলো ঈমান। মহান আল্লাহ্ অবকাশ দিলেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার। সরিয়ে নিলেন আযাব।

হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশ ত্যাগের জন্য ওঠলেন যাত্রিবোঝাই জাহাজে। জাহাজ মাঝ নদীতে আর চলে না। ডুবুডুবু ভাব প্রায়। ভেবে পায় না যাত্রীরা। কী করবে তারা? সবাই একমত হলো। সিদ্ধান্ত নিলো। লটারি করা হবে। যার নাম ওঠবে। তাকে ফেলে দেয়া হবে নদীতে। জাহাজ করা হবে নিষ্কন্টক। জাহাজ পৌঁছবে তার গন্তব্যে। কথা অনুযায়ী কাজ। ধরা হলো লটারী। নাম ওঠে এলো হযরত ইউনুসের আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এভাবেই নাম আসলো পর পর তিনবার। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পালা। সবাই এগিয়ে এলো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঝ নদীতে হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ফেলে দেয়া হলো জাহাজ থেকে।

নদীতে পড়লেন হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাবুডুবু খাচ্ছেন তিনি নদীতে। জাহাজ চলে গেলো গন্তব্যে। হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকড়াও করলেন। হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গিলে ফেললো একটি বড় মাছ। আল্লাহর নির্দেশে সে মাছ এসেছিলো বাহরি আখযার বা সবুজ সাগর থেকে। আর এ কারণেই তার উপাধি হলো যুননুন বা সাহিবুল হুত। মানে মাছ ওয়ালা। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল ছিলেননা হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তো আল্লাহর প্রিয় বান্দাহর একজন। যারা চলে আল্লাহর পথে। বলে ইসলামের কথা। ঘোষণা করে আল্লাহর পবিত্রতম মহিমা। প্রশংসা করে সুখে কিংবা দুঃখে।

মাছের পেটে ঢুকে হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুশোচনা আর অনুতাপে জ্বলতে লাগলেন। মনের কোণে ভেসে ওঠলো অপরাধবোধ। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়াই আযাবের ঘোষণা। বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ। রুজু হলেন আল্লাহরই দিকে। স্বীকার করলেন অপরাধের কথা। ঘোষণা করতে

থাকলেন আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমার কথা। 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমিন।' হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ (রক্ষাকর্তা) নেই! পাক-পবিত্র তোমার সত্তা! অবশ্যই আমি অপরাধী। মাছের পেটে অন্ধকারে প্রশংসা। পৌঁছলো মহামহিম আল্লাহর দরবারে। আরশে আযীমে। মার্জনা করলেন হযরত ইউনুসকে আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এক দিন আর দু'দিন নয়। চল্লিশ দিন পর।

আল্লাহর নির্দেশে মাছ ফেলে দিলো তার পেট থেকে। হযরত ইউনুসকে আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল অবস্থায়। তৃণ লতাহীন এক বিরাণ ভূমিতে। যেখানে ছিলো না কোনো শস্য খাওয়ার মতো। ছিলো না কোনো গাছ ছায়া দেয়ার মতো। সামান্যতম সবুজের সমারোহ সেখানে উৎপন্ন হলো। আল্লাহর ইশারায়। লতানো গাছ। অবিকল লাউ গাছের মতো। যার পাতা দিতো ছায়া। ফল যোগাতো আহার। মিটাতো পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা। গাছের ছায়া, খাদ্য ও পানীয়ে সতেজ হলেন হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আস্তে আস্তে হয়ে ওঠলেন সুস্থ। শরীরে পেলেন শক্তি। মহান আল্লাহ আবার পাঠালেন। নিনেভায় বসবাসকারী এক লক্ষ বা তার অধিক জনগণের কাছে। দিলেন দীনের দাওয়াত। ঈমান আনলেন অনেকেই। এভাবেই কিছু দিন টিকিয়ে রাখলেন নিনেভাবাসীকে। ইতিহাসে হয়ে থাকলো তারা অনন্য জাতি হিসেবে। অধৈর্য ও অন্যায়ের শিক্ষা পেলো বিশ্ববাসী। ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা পাওয়ার উপায়ও জানা হলো তাদের। *(সূরা সাফফাত অবলম্বনে)।*

প্রশ্ন

১. হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জাতির নবী ছিলেন?

২. হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অপরাধ করেছিলেন?

৩. হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম নদীতে কিভাবে পড়লেন?

৪. হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাওবাটি কী ছিলো?

৫. হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে বেঁচে ছিলেন?

ধর্মনিরপেক্ষতা ও নৈরাজ্যই শেষ করলো সাবা জাতির সব সৌন্দর্য

মহান আল্লাহ। বিশ্ব জাহানের একক স্রষ্টা।

এই সুন্দর আকাশ। বিশাল পৃথিবী। খাল-বিল, নদ-নদী। পাহাড়-পর্বত। সুন্দর সবুজ-শস্য শ্যামল বাগ-বাগিচা। কোথায় কী আছে আর কোথায় কি নাই। সবই আছে তাঁর জ্ঞানে। সব বিষয়ে তিনি জানেন ও শুনেন। আল্লাহ এ সব কিছু দিয়েছেন মানুষের উপকারের জন্য। ভোগ ও ব্যবহারের জন্য। আর আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বা শুকরিয়া আদায়ের জন্য। শুকরিয়া আদায় করলে কী হবে? বাড়িয়ে দিবেন নিয়ামত। আর শুকরিয়া আদায় না করলে দিবেন শাস্তি। শাস্তিটা হবে দুনিয়া ও

আখিরাতে। অনেক জাতিই নিয়ামত ভোগ করে। বজায় রাখে শৃঙ্খলা। আল্লাহর সৃষ্টি সৌন্দর্যের করে সুরক্ষা।

অনেকেই আল্লাহর সৃষ্টিতে করে বিশৃঙ্খলা। ফাসাদ ও নৈরাজ্য। ধ্বংস করে দেয় আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য, করে ফেলে তছনছ। আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেন। শাস্তিও দেন।

তবে আল্লাহর নিয়ম তাড়াহুড়া করে নয়। পাপী ও অপরাধীকে সাথে সাথে শাস্তি দেয়া। শরীর অবশ করা। অঙ্গহানী ঘটানো। মুহূর্তের মধ্যে মেরে ফেলা। আল্লাহর নিয়ম হলো ফাসাদ ও নৈরাজ্যকারীকে ঢিলে দেয়া। অনুশোচনা ও অনুতাপের পথে ফিরে আসার সুযোগ। আচরণ শোধরানোর সুযোগ। আচরণ সংশোধন করলে মাফ করে দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাই তার স্বভাব ও অভ্যাস। আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তারা ভুলে গেলেও আল্লাহ ভুলেন না।

তারা মনে করেছিলো আল্লাহ তাঁর রাজ্যে ক্ষমতাহীন রাজা। এরকমই একটি জাতির নাম সাবা। তাদের দেয়া হয়েছিলো অনেক নিয়ামত। তাদের আবাস ভূমি ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম আরব। যার বর্তমান নাম ইয়ামেন। কতিপয় গোত্রের সমন্বয়ে এ জাতির গড়ে ওঠা। মূলত সাবা ছিলো আরবের এক ব্যক্তির নাম। তার বংশ থেকে বেড়িয়ে আসা গোত্রের অন্যতম গাসসান। অতি প্রাচীনকালে আরবে এদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। পৃথিবীতে আসেন আল্লাহর নবী হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাদের সময়ে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী হিসেবে পরিচিতি পায় সাবা জাতি। ছড়িয়ে পড়ে তাদের নাম বিশ্বব্যাপী।

তারা করতো সূর্যের পূজা। পরিচিতি পায় সূর্য উপাসক হিসেবে। শাসন ক্ষমতা পায় রাণী বিলকিস। তখন হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ। হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাণী বিলকিসকে দেন ইসলামের দাওয়াত। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন রাণী বিলকিস। মুসলমান হলেন তিনি। ইসলাম গ্রহণ করেন জাতির অধিকাংশ লোকেরা। তাওহিদবাদী হিসেবে পরিচিতি পায় তারা।

কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় সাবা জাতি। কালের পরিক্রমায় বদলে যায় তাদের স্বভাব। তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে শিরক ও মূর্তিপূজা।

তাদের পরিচিতি হয় চন্দ্রপূজক হিসেবে। পূজা করতে থাকে সূর্যসহ আরো অনেক কিছুর। চন্দ্রদেবীর নাম হয় আমালাকা। সাবা জাতির বড় দেবতা এই আমালাকা। সাবা জাতির বাদশাহ পূজা গ্রহণের জন্য যোগ্য মনে করতো নিজেকে। আমালাকার প্রতিনিধি হিসেবে। সাবা জাতির বাদশাহর উপাধি ছিলো মুকাররিব। এক সময় ত্যাগ করে এ উপাধি। গ্রহণ করে মালিক বা বাদশাহ উপাধি। তখনই চলে যায় ধর্মীয় চেতনাবোধ।

ফিরে আসে রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা। রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রাধান্য পায় ধর্মনিরপেক্ষতা। সাবা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান ছিলো দুইটি। কৃষি ও ব্যবসায়। কৃষিতে তাদের ছিলো নৈপুণ্য। করেছিলো প্রভূত উন্নতি সাধন। দেশটি ছিলো নদীসমৃদ্ধ। বর্ষাকালে পাহাড়ি ঝরনা প্রবাহিত হতো। ঝরনাগুলোতে বাঁধ দিতো তারা। সৃষ্টি করতো কৃত্রিম হ্রদ। হ্রদগুলো থেকে শুরু হয় খাল কাটা কর্মসূচি। আর খালের পানি সেচ দিয়েই তারা চালাতো কৃষি কাজ। এর মাধ্যমেই চলে গেলো সফলতার চরম শিখরে।

কুরআনে বলা হয়েছে এ কথা এভাবে। সবুজের সমারোহে ভরে গিয়েছিলো মাঠ। যেদিকে তাকাবে শুধু সে দিকেই দেখবে। চোখ জুড়ানো। মনমাতানো বাগ-বাগিচা। সবুজ-শ্যামল গাছ-গাছালি। ব্যবসার জন্য আল্লাহর নিয়ামত ছিলো। সুন্দরতম ভৌগোলিক অবস্থান। তারা গ্রহণ করে পূর্ণ সুযোগ। পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো তারা। তাদের কাছে চলে আসতো চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালাবার হিন্দুস্থানের ও পূর্ব আফ্রিকার পণ্য। তারা পৌঁছে দিতো মিসর ও সিরিয়ার বাজারে।

সেখান থেকে চলে যেতো গ্রিস ও রোমে। এছাড়া তাদের উৎপন্ন ফসল ছিলো অনেক। তাদের বাণিজ্য চলতো সমুদ্র ও স্থল পথে। আল্লাহর নিয়ামতে তারা হয়ে ওঠে সম্পদশালী। গর্ব অহংকারে মেতে ওঠে তারা। ব্যবহার করে সোনা ও রূপার পাত্র। বাড়ির ছাঁদ দেয়াল ও দরজায় ব্যবহার হতো সোনা, রূপা, জহরত ও হাতির দাঁত। বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসায় তারা। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে দারুচিনি, চন্দন ও সেগুন কাঠ। আকাশ ছোঁয়া বিশতলা ইমারত হয় তাদের বাসস্থান। গর্ব অহংকারে ফেটে পরে তারা। চরমভাবে অস্বীকার করে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা।

আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি হয় অকৃতজ্ঞ। পৌঁছে যায় বাড়াবাড়ির চরম পর্যায়ে। আবরাহা উদ্যত হয় কা'বা ঘর ধ্বংসের নেশায়। সরে যায় আল্লাহর অনুগ্রহের বৃষ্টি। ভেঙ্গে যায় সেচ ব্যবস্থার বাঁধ। ধ্বংস হয় সবুজ-শ্যামল খেত। নয়নাভিরাম বাগ-বাগিচা। বে-দখল হয় ব্যবসার স্থল ও নৌ-পথ। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় তাদের বাহাদুরী। নাম নিশানা মুছে যায় পৃথিবী থেকে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পরে তারা। শুধু ইতিহাস হয়ে থাকে বিপর্যয়কারী হিসেবে। বিশৃঙ্খলার প্রবাদে ওঠে আসে তাদের নাম। আরব জাতি কারো মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখলে আজও বলে। ওরা তো সাবা জাতি। ফাসাদ সৃষ্টিই ওদের কাজ। সব সৌন্দর্য ও ধ্বংসের কারণই হয় ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিশৃঙ্খলা। *(সূরা সাবা অবলম্বনে)*।

<u>প্রশ্ন</u>

১. সাবা জাতির বাসস্থান কোথায় ছিলো?

২. রাণী বিলকিস কার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন?

৩. সাবা জাতি কিসের পূজা করতো?

৪. সাবা জাতির গর্বের বিষয় কী ছিলো?

৫. কী কারণে সাবা জাতির পতন হলো?

দোলনা থেকেই নবী হলেন ঈসা রুহুল্লাহ

হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহর নবী হযরত মুসা ও হযরত হারুনের আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বোন। পিতার নাম ইমরান। তিনি ছিলেন দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর। পবিত্রা সচ্চরিত্রা সুন্দরী ও কুমারী মেয়ে মারইয়াম। মায়ের মানত অনুযায়ী উৎসর্গিত হলেন আল্লাহর জন্য। আশ্রয় নিলেন পবিত্র মসজিদ জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাসে। পূর্ব পাশের এক কোনে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে। জনগণ থেকে আলাদা থাকার জন্য সে পর্দা করলো। অবশ্য খালু হযরত যাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখা শুনা করতো তাকে । খাদ্য ও পানীয়ের যোগান দিতো হযরত যাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই।

মাঝে মাঝে পাহাড়ি সব ফল মূল ও খাবার দেখে অবাক হতেন হযরত যাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞেস করতেন হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে, এসব কে দিয়েছে তোমাকে? উত্তরে তিনি বলতেন। এসব এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। নির্জন বাস ও ধ্যানমগ্ন চিত্ত। চললেন একদিন গোসলখানার দিকে। থমকে দাড়ালেন হঠাৎ। ভড়কে গেলেন তিনি। সামনে দাঁড়ালেন সুর্দশন ও তাগড়া এক যুবক।

অপরিচিত যুবক সে। কি ই বা উদ্দেশ্য তার। এখানেই বা কেন এসেছেন? হাজারো প্রশ্ন উঁকি মারছে তার মনের কোনে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আগন্তুক যুবক আসলে মানুষ নয়। সে আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতা। জিবরীল আমিন বা পবিত্র আত্মা তিনি। মহান আল্লাহই পাঠিয়েছেন তাকে। মানুষের আকৃতিতে ও যুবকের সুরতে। ফিরিশতা হলে কী হবে? কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারেননি হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলে ওঠলেন। তোমার থেকে আমি আশ্রয় চাই। মহান আল্লাহর কাছে। যদি তুমি আল্লাহর ভয়ে ভীত হও।

অভয় জানালেন ফিরিশতা জিবরীল আমিন। ভয় নেই হে মারইয়াম! আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। তোমাকে দান করবো এক পবিত্র পুত্র সন্তান। লজ্জাবনত কুমারী মেয়ে। হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হলেন আরো অনেক বেশি। এ কী করে সম্ভব? আমিতো কুমারী! স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ কোনো দিন। প্রশ্নের মুখে পড়বে আমার সতীত্ব? আমি নই ব্যভিচারী কোন মহিলাও। তাহলে কি নষ্ট হবে আমার কুমারীত্ব?

পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না ফিরিশতাকে। ভয়ে ভীতো সে। চিন্তার জগতে ঘুরপাক খায় ঘূর্ণিপাকের মতো। শত অজানা আশংকা। বাড়তে থাকে সন্দেহ আর সংশয়। আশ্বস্ত করলেন ফিরিশতা। বললো এমনি করেই হবে। তোমার প্রতিপালকের কাছে এটি খুবই সহজ এবং সম্ভব। তিনি এটা করবেন তার নিদর্শন ও রহমত হিসেবে। আর এটি আল্লাহরই সিদ্ধান্ত।

গর্ভধারণ করলেন হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লোকলজ্জা আর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চলে গেলেন দূরে। অ-নে-ক দূরে। প্রসব বেদনায় কাতর। জন মানব শূন্য। খাদ্য পানীয়ের তীব্র অভাব। দুঃখ ভারাক্রান্ত মন। জাতির কাছে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত। শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। প্রথম সন্তানসম্ভবা নারীর অসুবিধা হচ্ছে তার। কখন কী করতে হবে। কিছুই জানেন না তিনি।

আশ্রয় নিলেন জনমানবশূন্য একটা খেজুর গাছের নিচে। আক্ষেপ করতে লাগলেন বেদনাতুর কণ্ঠে। ভগ্ন হৃদয়ে। আফসোসের সুরে। বললেন তিনি। কী হলো আমার? কতোই না ভালো হতো। যদি আমি মরে যেতাম! অথবা হারিয়ে যেতাম মানুষের হৃদয় থেকে। মুছে যেতো আমার নাম নিশানা। হঠাৎ শুনতে পেলেন নীচের দিক থেকে প্রকট আওয়াজ। আল্লা হর ফেরেশতা বললো তুমি ভয় পেওনা। চিন্তাও করোনা।

তোমার রব তোমার পায়ের তলায় ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন। খেজুর গাছের কাণ্ড নাড়া দাও। তোমার দিকে খেজুর পড়বে। তা থেকে তৃপ্তিসহ তুমি খাও। পান করো এবং চোখ জুড়িয়ে শীতল করে নাও। কোনো মানুষ দেখলে বলে দিও। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছি। কাজেই কোনো মানুষের সাথে আমি কথা বলবোনা।

শত দুঃখ আর কষ্ট। বেদনার অন্ধকারে আশার আলো জ্বলে ওঠলো। দেখা দিলো সম্ভাবনার নতুন সূর্য। খেজুর ও পানি খেয়ে শক্তি পেলো হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভূমিষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে চলে গেলেন হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লোকালয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে ভর্ৎসনা ও উপহাস করলো। হে মারইয়াম! তুমি কিভাবে ঘটালে এমন ঘটনা? তুমিতো উঁচু বংশীয় মেয়ে। তোমার বাপও খারাপ লোক নয়। তোমার মাও তো ব্যভিচারিণী ছিলোনা।

কষ্টের ভারী পাথর বুকে। নিরুত্তর হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইশারা দিলেন কোলের সন্তানের দিকে। যা বলার বলবে কোলের শিশু। হতবাক! হতবাক সম্প্রদায়ের লোকেরা। কুমারী মাতা। সন্তুষ্ট ও বেজায় খুশি কোলের শিশুর প্রতি। হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি উপাধি পেয়েছেন 'সাইয়্যেদাতুন নিসায়ী আহলুল জান্নাত'। তারা বললো সেতো কোলের শিশু। আমরা কিভাবে তার সাথে কথা বলবো। তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করছো?

অলৌকিকভাবে হযরত ঈসা বলে ওঠলেন। আমি আল্লাহর বান্দা। আমাকে দেয়া হয়েছে কিতাব। করা হয়েছে নবী। যেখানেই থাকি না কেন

করা হয়েছে বরকতময়। নির্দেশ দেয়া হয়েছে নামাজ ও যাকাত আদায়ের। মায়ের আনুগত্য করতে। যতদিন জীবিত থাকবো ততোদিন। আমাকে করা হয়নি হতোভাগা। সৌভাগ্যবান করা হয়েছে আমার জন্মদিন।

মৃত্যুবরণ করার ও কিয়ামতে ওঠার দিন। আল্লাহ বললেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা। সত্য কথা কি জানো? যে বিষয়ে লোকেরা বিতর্ক করে। আল্লাহ এমন নন তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা। তিনি কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নিলে বলেন 'হও'। আর অমনি তা হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ পালন কর্তা আমারও এবং তোমাদেরও।

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। এটিই সহজ সরল ও সোজা পথ। এসব বিষয়ে প্রমাণ হয়। ঈসা 'রুহুল্লাহ' অনেকটা আদম ও হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতো সৃষ্টি। আল্লাহ বিরোধী লোকদের কথা অযৌক্তিক ও অনৈতিক। ভ্রান্ত পথিকেরা এভাবেই করে সত্যের অপলাপ। আলোর মধ্যেও হাতড়িয়ে বেড়ায় অন্ধকার। সত্য হারাতে চায় অসত্যের চোরাবালিতে।

(সূরা মারইয়াম অবলম্বনে)।

প্রশ্ন

১. হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছিলেন?

২. হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাহাড়ি ফল কোথা থেকে আসতো?

৩. হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যুবকবেশে কে এসেছিলেন?

৪. হযরত মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তানের নাম কী?

৫. লোকেরা হযরত মারইয়ামকে আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অপবাদ দিয়েছিলো?

আল কুরআনের গল্প

বিশিষ্টজনদের অভিমত

'আল কুরআনের গল্প' প্রিয়ভাজন এস. এম রুহুল আমীনের একটি সৃজনশীল রচনা। এ বইতে কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলিকে গল্পের ভিত্তি বানানো হয়েছে। সাহিত্যিক রস পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পগুলো শিক্ষামূলক। এ বইটি যুবসমাজকে নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধের অনুসারী হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

এস. এম রুহুল আমীন লেখক হিসেবে নবীন। বইটিকে আরো উন্নত করার ব্যাপারে আমি কিছু পরামর্শ দিয়েছি। ভবিষ্যতে লেখার ময়দানে এস. এম রুহুল আমীন আরো এগিয়ে যাবেন এবং জাতিকে আরো ভালো ভালো বই উপহার দেবেন আমি আশা রাখি। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

আবদুস শহীদ নাসিম
নভেম্বর ১৫, ২০১৪ ঈসায়ী

'আল কুরআনের গল্প' বইটিতে এস. এম রুহুল আমীন সরল বর্ণনার ভেতর দিয়ে কাহিনী শোনাতে চেয়েছেন। গল্পগুলো বানানো নয়- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের কাহিনী। ভাষা এবং ভঙ্গিটি কেবল লেখকের। পাঠক এই বইটি পড়লে আনন্দের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। বইটি কাঠামো এবং পরিবেশনশৈলী চমকপ্রদ। প্রতিটি গল্পের শেষে প্রশ্নমালা সংযুক্ত থাকায় পাঠক তার চিন্তাকে খানিকটা মানিয়ে নিতে পারিবেন সহজেই। অনুভবজ্ঞানে পরিশুদ্ধ হবার জন্য এটি একটি অবশ্য পাঠ্য বই হতে পারে। কুরআনের কথা এভাবে- গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রচার করার প্রচেষ্টার জন্য লেখক প্রশংসিত হবেন আশা করি।

ড. ফজলুল হক সৈকত
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
সংবাদ পাঠক ও অনুষ্ঠান উপস্থাপক, বাংলাদেশ বেতার
ভাষা-প্রশিক্ষক, শিল্প-সাহিত্য বিশ্লেষক, কবি কথানির্মাতা ও কলাম লেখক

এস.এম রুহুল আমীন রচিত 'আল কুরআনের গল্প' বইটির পান্ডুলিপি পড়লাম। সত্যিকার তথ্যাবলি দিয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শিক্ষামূলক বিবরণীকে শিশু কিশোরদের জন্য গল্পের মতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে চমৎকারভাবে। আল্লাহর নবীদের এবং ইসলামের অতীত ইতিহাসের নেক বান্দাহদের ত্যাগ ও কুরবানীর একটি অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে এ গ্রন্থটিতে। শিশু কিশোরদের জন্য সত্য কাহিনী ভিত্তিক এই বইয়ের ভাষা সাবলীল, মূলানুগ, ঝরঝরে, যাদের জন্য লেখা তাদের উপযোগী। যারা নাতি-নাতনিদের অবসর সময়ে গল্প শোনান তারাও এ থেকে উপকৃত হবেন সমানভাবে। বইটি পাঠ্য বইও হতে পারে।

এ দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে ইসলামের সত্যিকার ইতিহাস ছড়িয়ে দেয়ায় এবং শিশু-কিশোরদের সুস্থ মন মানসিকতা বিকাশের বই 'আল কুরআনের গল্প' ফাহিম বুক ডিপোর ছাপানোর উদ্যোগ সময় উপযোগী প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। আমি বইটির বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি।

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
বিশিষ্ট লেখক, টিভি উপস্থাপক ও ব্যাংকার
অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক

প্রচ্ছদ : কামরুল ইসলাম

ফাহিম বুক ডিপো
পাঠক বন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২২৮৭৬৯৫, ০১৯১৫৭১৭১৪৭
E-mail : fahimbookdepo11@gmail.com